চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

ষোড়শ বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ প্রথম সংখ্যা

Small entrepeneurs in West Bengal should take full advantages of the following facilities offered by W. B. S. I. C.

(a) **Financial assistance on easy terms for the procurement of indegenous and imported raw materials.**

(b) **Accommodation in the Industrial Estates with infrastructural facilities.**

(c) **Accommodation in the Commercial Estates with nominal rent.**

(d) **Supply of scarce categories of raw materials.**

THE WEST BENGAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING)

6A, Raja Subodh Mullick Square, (3rd Floor),

CALCUTTA-700013.

SUREKHA STEEL COMPANY

IRON STEEL MERCHANTS
COMMISSION AGENTS & ORDER SUPPLIERS

Office .

7, WATERLOO STREET, (1ST FLOOR)
CALCUTTA-700001

"WITH BEST COMPLIMENTS
TO
Indian Psycho-Analytical Society"

FROM
"A WELLWISHER"

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

গিরীন্দ্রশেখর ক্লিনিক

১৪, পার্শিবাগান লেন । কলিকাতা-৯

ফোন নং ৩৫-৮৭৮৮

বিশেষজ্ঞ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সকল রকম মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র । রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অন্য সকল দিন সকাল ১০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত খোলা ।

সামান্য হইলেও মানসিক রোগ অবহেলা করিবেন না ।

নৃত্যের পাঁচালি

রমেশ দাশ *

ঋতুর রঙ্গমঞ্চে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটে—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, তারপর ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ঘটে শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্তের। গ্রহ নক্ষত্ররাজি নির্দিষ্ট গতিতে চি..ত পথ পরিক্রমা করে চলে। তালে তালে তরঙ্গমালার উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হয়, ..দ ও প্রাণীর জীবনে এক একটি স্তরে এক এক ধরণের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃ সকল প্রকার অস্তিত্বের মধ্যেই একটি নিয়মনিষ্ঠা, সুনির্দিষ্ট গতিশীলতা বা ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির পরতে পরতে ছন্দের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রাণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলে ছন্দ হয় সঙ্গীত, আর তার চরণে স্পন্দিত হলে সৃষ্টি হয় নৃত্যের। নৃত্যের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। পদার্থবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যে সব অনু-পরমানু দিয়ে বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি স্থাবর নয়, জঙ্গম—তারা অবিরাম অবিশ্রাম নৃত্যরত। তাদের নর্তনের ফলেই তাদের মধ্যে ঘটেছে নব নব সমন্বয়, বিলুপ্তি ঘটেছে পুরাতন সংহতির। এমনি করে সৃষ্টি হচ্ছে নূতন পদার্থের, ধ্বংস ঘটছে পুরাতনের। সুতরাং বলা যেতে পারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে আছে নৃত্য। নূতন সমন্বয়ে নূতন সৃষ্টি, সমন্বয়ের অবস্থানে স্থিতি, তার বিলুপ্তিতে প্রলয়।

উদ্ভিদ জগতে নৃত্যের সন্ধান দিয়েছেন, জীববিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র। তার লিখিত "অব্যক্ত" গ্রন্থে বনচাঁড়ালের নৃত্যের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 'সঞ্চিত উদ্বৃত্ত শক্তির উৎসার ঘটে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দনে, অর্থাৎ নাচনের মধ্যে। মনোবিজ্ঞানী কবি Schiller ও Spencer এর 'অতিরিক্ত শক্তি তত্ত্ব'—এর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের এই মতবাদের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। Schiller ও Spencer মনে করেন সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির (Surplus energy) বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিশুর খেলাধূলায়, আর জগদীশচন্দ্রের মতে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দনের কারণ তার "সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছাস"।

---

* অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ)

উদ্ভিদের আধ্যাত্ম-চেতনার কথা সাধারণ মানুষের কাছে উন্মাদের উদ্ভট কল্পনা মাত্র। তবে মহাযোগী চরণদাস বাবাজী এই কল্পনাকেই বাস্তব বলে প্রমাণ করে-ছিলেন (ভারতের সাধক—৪র্থ খণ্ড, শঙ্করনাথ রায়)। দিগ্‌নগর গ্রামের একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের দৈবী শক্তি উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে—বট বৃক্ষটিকে ঘিরে তিনি যখন তদ্গত চিত্তে নৃত্য ও কীর্তনে আত্মহারা, তখন উপস্থিত সকলের সমক্ষে একটি অলৌকিক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হলো, বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করলো বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি বাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে উদ্দাম নৃত্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

সতীহারা শিব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যখন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেন তখন বিশ্বসংসার ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। সুতরাং নৃত্যের মধ্যে ক্রোধেরও স্ফূরণ হয়, যদিও আমরা সাধারণতঃ নৃত্যের মধ্যে শুধু আনন্দেরই উচ্ছ্বাস ঘটে বলে মনে করে। মানুষ ক্রুদ্ধ হলেও যে নৃত্য করে তার প্রমান আদিম জাতির যুদ্ধ-প্রণালী। কাড়া-নাকাড়া,শিঙ-দামামার সম্মিলিত গুরু গম্ভীর শব্দের তালে তালে তীর-ধনুক, বর্শা-সজ্জিত উভয় প্রতিপক্ষের নির্দিষ্ট মাত্রায় পা ফেলে ফেলে পরস্পরের সম্মুখীন হবার মধ্যেই ক্রোধাশ্রিত নৃত্যের চিত্রটি পরিস্ফূট। আজও প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হলে আমাদের হাত-পা, সর্ব অঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। একেও নৃত্যেরই রূপান্তর বলা যায়। বস্তুতঃ নৃত্যে ছন্দের প্রধান আশ্রয় চরণ হলেও সর্ব অঙ্গেই তার স্পন্দন জাগে।

অবশ্য একথাটা ঠিক যে সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ নৃত্যের মধ্যে আনন্দ বা উল্লাসেরই উচ্ছ্বাস ঘটে থাকে। অরণ্যচারী বন্য মানুষের আনন্দানুষ্ঠানে মাদল সহকারে উদ্দণ্ড নৃত্য, বিবিধ লোকনৃত্য, কীর্তনানন্দে বিভোর ভক্তবৃন্দের বিহ্বল নর্তন, ধনীর দরবারে নর্তকীর নূপুর নিক্বন, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্যাঞ্জলি, শিল্পমঞ্চে সৌখিন শিল্পীর নৃত্য নিবেদন—এ সবের মধ্যে আনন্দেরই উৎসার ঘটতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুপক্ষীর নৃত্যের পশ্চাতেও থাকে তাদের আনন্দ-বোধ। আকাশে মেঘ সঞ্চার হলে আনন্দে ময়ূরী নৃত্য করে, প্রভুর দর্শনে ভক্ত কুকুর নৃত্যের মাধ্যমে তার আনন্দ প্রকাশ করে, হরিণ শিশু 'অকারণ পুলকে' নেচে বেড়ায়।

নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার রীতিটা আদিম হলেও বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ যেন এ রীতিটাকে স্বীকার করে নিতে পারছেনা। ক্রমে ক্রমে নৃত্য তাই মাত্র একটি শিল্প কলায় পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু নৃত্যের স্পৃহাটি আদিম বলেই যেন দুনিবার। তাই সভ্য মানুষের চরণে নৃত্য আন্দোলিত না হলেও তার হৃদয়কে সে আন্দোলিত করে। এই সত্যটি বিশ্বকবির রচনায় সার্থকভাবে প্রকটিত হয়েছে

যখন তিনি গেয়ে উঠেছেন—"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে, হৃদয় নাচেরে।" আনন্দের সংবাদ পেলে আমরা প্রায়ই বলে থাকি—'এ সংবাদে আমার মন নেচে উঠেছে।'

নৃত্যের মধ্যে একটা নেশা বা মাদকতা আছে। একবার নাচতে সুরু করলে সহজে আর থামা যায় না। "Off the Ground" কবিতায় কবি তিনটি সরল গ্রাম্য কৃষকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তারা বাজি রাখলো নেচে নেচে সমুখ বরাবর এগিয়ে যাবে, থামা চলবে না; থেমে গেলেই বাজিতে হার হবে। তারা মহানন্দে নেচে চললো। কত গ্রাম-নগর, অরণ্য-প্রান্তর একে একে তারা অতিক্রম করে গেল, তবু তারা থামলোনা। অবশেষে এসে পড়লো সমুদ্রের উপকূলে। এবারে দুজন কৃষক ক্ষান্ত হলো, কিন্তু তৃতীয় জন তার নাচন না থামিয়ে নেমে গেল সমুদ্রের নীল জলে। নেচে নেচে সে এগিয়ে চললো—ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের জলরাশি তাকে গ্রাস করে ফেললো। দুই বন্ধু সমুদ্রতটে অদৃশ্য বন্ধুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত অর্থ রেখে অশ্রুজলে বিদায় নিলে। তারপর কবি কল্পনা করেছেন বিজয়ী কৃষক কেমন করে সুনীল সমুদ্র-গর্ভে স্বর্ণকান্তি মৎস্যকন্যাদের সাহচর্যে শ্বেত প্রবাল প্রাসাদে মহানন্দে দিনাতিপাত করতে লাগলো তার কথা। অর্থাৎ আনন্দ থেকেই নৃত্যের উদ্ভব শুধু নয়, নৃত্যের পরিণতিও আনন্দ। "চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুমুদুম্বরম সূর্য্যাস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্, চরৈবেতি চরৈবেতি"—ঋষি কণ্ঠের এই অমর বাণীর তাৎপর্যটিও অনুরূপ।

নৃত্যের যে নেশা আছে যারা কখনো কীর্তনে যোগ দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাঁদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত নর্তনের যেন ক্ষান্তি আসে না।

কোন কোন ব্যাধির মতো নৃত্যও সংক্রামক। কীর্তনীয়াদের নাচতে দেখে দর্শক-দের মধ্যেও ধীরে ধীরে নৃত্যের স্পৃহা উজ্জীবিত হয়। তারাও ধীরে ধীরে নৃত্য শুরু করে দেন আর অচিরে বিভোর হয়ে পড়েন। মান-মর্যাদার অভিমান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় নগরীগুলিতে নৃত্যস্পৃহা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল ('A Dictionary of Psychology—James Drever)। মনস্তাত্বিকেরা এর নাম দিয়েছেন Dancing Mania। কারণস্বরূপ তারা জনমানসে গণমনের প্রভাবের (result of mass suggestion) কথা বলেছেন। ম্যানিয়া হল কোন কিছু বার বার সম্পাদন করবার জন্য প্রচণ্ড ভাবে অনুভূত এক দুর্নিবার ও দুর্দম অন্তর্তাড়না (uncontrollable impulse)।

শ্রীচৈতন্য যখন তাঁর পার্ষদবর্গের সঙ্গে নেচে নেচে নাম-সঙ্কীর্তন করে পথ পরিক্রমা করতেন তখন শত শত দর্শক উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ভিড়তো—নৃত্যানন্দে উত্তাল জনসমুদ্র সে এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করতো।

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে নৃত্যের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে মনে হয়। আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীন অধ্যাপক। বয়েস তাঁর ষাট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ তারুণ্য তাঁর অপর্যাপ্ত। কেশে পাক ধরেনি, কর্মক্ষমতা অটুট আছে দিন-রাত্তির নানা কাজে ছুটে বেড়াচ্ছেন অথচ প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব নেই। কথায় কথায় তাঁর সরস মন্তব্য আর দিলখোলা উচ্চ হাস্য পরিচিত মহলে তাঁকে বিস্ময় ও প্রীতির পাত্র করে তুলেছে। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর এই তারুণ্য ও প্রাণ প্রাচুর্যের রহস্যটি কি? উত্তরে তিনি বললেন—"আমি প্রতিদিন একবার ঘরে খিল এঁটে তাই-রে-নাই-রে-না বলে কয়েক পাক নেচে নিই, আমার বিশ্বাস আমার সজীবতার এটাই আসল রহস্য।" এমন আরও দুচার জনকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানি যাঁরা বাইরে খুব গম্ভীর ও নীরস বলে পরিচিত, অথচ আপন গৃহে শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই মাঝে মাঝে নৃত্য করেন এবং আমি জানি তাঁরা সন্তুষ্ট ও সুখী মানুষ। নৃত্যকে তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোব্যাধির একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি (Therapeutic Method) রূপেও ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৃত্য পদ্ধতি (Dance Therapy) নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

নৃত্যের মাধ্যমে অবদমিত সঞ্চিত উষ্মা (anger), আক্রোশ (aggression), উদ্বেগ (tension), উৎকণ্ঠা (anxiety) ইত্যাদি ক্ষতিকর মানসিক অবস্থাগুলির উদ্গতি (sublimation) ঘটে। প্রচণ্ড হস্ত-পদ ও অঙ্গসঞ্চালনের ভেতর দিয়ে সঞ্চিত আক্রোশেরই নিষ্কাশন (catharsis) ঘটে।

এমনি করে মন ভারমুক্ত (relaxed) হয়ে তার সহজ ও সাম্যাবস্থা ফিরে পায়। সুতরাং নৃত্য শুধু বিলাস নয়, শুধু শিল্প নয়, এর ব্যবহারিক মূল্যটিও বড কম নয়।

বিশ্বসংসার ছন্দবদ্ধ। ছন্দপতন ঘটলে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। ছন্দোদ্ধার করতে হলে ছন্দসংযোজনার প্রয়োজন। নৃত্য হলো ছন্দের একটি সার্থক রূপ।

ভালবাসা, প্রত্যাখ্যান ও মানসিক স্বাস্থ্য

অমরেন্দ্র নাথ বসু *

(দুই)

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়া সম্বন্ধে শিশুর ধারণা তার মানসিক স্বাস্থ্য নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মা-বাবারা যথেষ্ট ভালবাসা দিচ্ছেন, একথা মনে করলেও শিশুরা অনেক সময় তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে কেন? পূর্বের আলোচনায় এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল যার মধ্যে দেখা যায় যে কেবলমাত্র মা-বাবার সান্নিধ্যের মধ্যেই শিশুর পক্ষে তাদের ভালবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। অতি আধুনিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, "......the physical presence of a parent or a foster parent does not gurantee emotional satisfaction to the child, especially if that parent is unable to tolerate any disturbance in behaviour on the part of the child" (Danė G. Prugh & Robert G. Harlow) অনেক সময় এরূপও দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্যই শিশুকে তার বাড়ীতে মা-বাবার কাছে না রেখে কোনও বোর্ডিং-এ রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। মা-বাবার সান্নিধ্যে থেকেও শিশু তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এরূপ অবস্থাকে বলা যেতে পারে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কে বিকৃতির পরিস্থিতি (distortion in the affectional relationship)। এই পরিস্থিতির উদ্ভব নানা ভাবে হতে পারে। যেমন, মা-বাবা যদি শিশুর প্রতি সব সময় একটা অত্যধিক 'দুর ছাই' গোছের ভাব পোষণ করেন; শিশুকে যদি প্রায়ই বকা-ঝকা ও মার-ধরের সাহায্যে পীড়ন করেন; এবং শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব যদি প্রায়শঃই বিরক্তি ও ভালবাসার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, তাহলে শিশুর মনে সহজেই বঞ্চনার বোধ জাগতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বিকৃত ভালবাসার পরিস্থিতির বীজ প্রধানতঃ মা-বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। মা-বাবার এরূপ ব্যবহারের ফলে মা-বাবা সম্বন্ধে শিশুর মনে

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

একটা বিকৃত ও অস্পষ্ট ধারণা দেখা দিতে থাকে। এই ভাবে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আমরা বিকৃত সম্পর্ক এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক বলতে পারি।

এবারে দেখা যাক এই বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক কত রকম ভাবে দেখা দিতে পারে। প্রথমে মা-বাবা শিশুকে নিজেদের আশা-আকাঙ্খা ও মুল্য বোধ চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে মনে করতে পারেন। সন্তানের যে একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে, একথা তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। সন্তানের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সুখ যে আলাদা রকমের হতে পারে তা তারা বুঝতেই চান না।

ঘটনা নং ৭। পিন্টু পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মা-বাবার ইচ্ছা পিন্টু ক্লাশে প্রথম হবে। পিন্টুর মাসিমার ছেলে গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাশে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তাই মা-বাবা পিন্টুর মনে এই প্রথম হওয়ার আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত রাখতে ব্যস্ত। পিন্টু মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু ওর মা তার বন্ধুদের কাছে গল্প করেন, পিন্টু পড়াশুনায় খুব ভাল, ওর খুব বুদ্ধি, কাজেই ও বার্ষিক পরীক্ষায় অবশ্যই প্রথম হবে। এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, নিজের মূল্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পিন্টুর সামনেই এসব কথা-বার্তা হয়। মা-বাবা ওকে বলেছেন এবার প্রথম হলে ঘড়ি কিনে দেবেন। এই ভাবে পিন্টুর পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে এক কল্পনার সৌধ গড়ে উঠতে থাকে। এদিকে পরীক্ষা যতই সন্নিকটবর্তী হয় পিন্টু যেন কিরকম হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় মা-বাবার আকাঙ্খিত ফল সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পরীক্ষা সম্বন্ধে ভয় বাড়তে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফূর্তি কমে যায়। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে হঠাৎ গা বমি-বমি ভাব দেখা দেয়। শরীর খারাপ হয়ে যায়। একদিন দেখা গেল ওর সারা গায়ে ফুসকুড়ি (rash) বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

ঘটনা নং ৮। অনুরূপ আর একটি ঘটনা। মিন্টু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ওর সম্বন্ধে মা-বাবার খুব উঁচু ধারণা। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা সম্বন্ধে তাঁরা সর্বত্রই গল্প করে বেড়ান। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা, ওর পরীক্ষার ফল, প্রভৃতি সব কিছুর পিছনে যে তাঁদের যত্ন, চেষ্টা ও সতর্ক দৃষ্টি কাজ করছে, একথা বলতে তাঁরা কখনও ভোলেন না। এর মধ্যে তাঁরা একটা সুখ অনুভব করেন। তাঁদের এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সচ্ছল লেখা-পড়া জানা ঘরে এরকম ছেলে না হলে কি মানায়? তাঁদের কৃতিত্ব যে তাঁরা ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাকে পড়াশুনায় আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি-শ্রুতি দেওয়া হয় যে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলে সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। পরীক্ষার শেষে মিন্টুও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মা-বাবার মনমত কথা-বার্তা বলতে

থাকে। পরীক্ষার ফল বের হলে বাড়ীতে এসে বলে যে সে প্রথম হয়েছে। মা-বাবা স্কুলের রিপোর্ট বই দেখতে চাইলে মিন্টু তাঁদের বলে যে রিপোর্ট বই দেওয়া হয় নি। কারণ ছাপাখানায় গোলমালের জন্য রিপোর্ট বই সময়মত স্কুলে এসে পৌঁছায় নি। কাজেই ফল মুখে ঘোষণা করা হয়েছে। মা-বাবারও বোধ হয় নিজেদের কামনা-পূর্তির ব্যগ্রতায় সমস্ত বোধশক্তি অবলুপ্ত হয়েছিল। মিন্টুর কথায় সন্দেহ করেননি; অথবা সন্দেহকে অবদমন করেছেন। মিন্টুর সাইকেল এল। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও ওর মনে কোন আনন্দ নেই। ও সব সময়ই একটা অস্বস্তি বোধ করে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। অবশেষে বড়দিনের ছুটির পর যখন স্কুল খুললো তখন আস্তে আস্তে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন হলো।

এই দু'টি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবা সন্তানকে নিজেদের উচ্চ আকাঙ্খা চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলের সাথে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মূল্য ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সন্তানের প্রয়োজন, তার ক্ষমতা এখানে গৌণ। তাই সন্তানের উপর অনবরত চাপ এসে পড়ছে। আর এই চাপের ফলে সন্তান তার মা-বাবার ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না। সব সময় ভালবাসা হারাবার ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। সে মনে করে যে মা-বাবার আকাঙ্খা পুরণের মধ্যেই তার মূল্য। তা না হলে সে পরিত্যাজ্য। ফলে এই মূল্য বজায় রাখার জন্য সে কখনও আশ্রয় নিচ্ছে রোগের, কখনও বা নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার। ফলে তার আবেগ-জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়।

"...the child is not viewed as an individual with integrity in his own right, but rather, in some way, as a being responding to the needs, and feelings of the parent, with the result that his emotional needs are not met adequetely." (Dane G. Prugh & Robert G. Harlow)
দুঃখের বিষয় এরূপ পরিস্থিতির পরেও তাঁদের বলতে শোনা গেছে, "ছেলের জন্য এত করলাম, ছোটবেলা থেকে ওকে এমন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম, দিন-রাত ওর কথাই ভাবি, শেষ পর্যন্ত কিনা এই হলো? ও আমাদের সর্বনাশ করেছে। এমন ছেলেকে দূর করে দেওয়া দরকার।" অবশেষে তাঁরা এই মনে করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন যে পাড়ার খারাপ ছেলেদের দলে পড়েই ছেলে এমনি হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা অথবা মা তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে এত বড় করে দেখেন যে সন্তানকেও তাঁরা সেই ধ্যান-ধারণার একটা

অংশ বলে মনে করেন। যেমন—ঘটনা নং ৮। দীপু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা সাধারণ চাকরী করেন। মাও চাকরী করেন। ফলে দীপু শৈশব থেকেই পিসি ও দিদির কাছে বড হতে থাকে। মা সংসার ও চাকরী নিয়ে ব্যস্ত। বাবা ততোধিক ব্যস্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। তিনি দীপুকে সেই মতাদর্শে গড়ে তুলতে চান। তিনি কল্পনা করেন যে দীপু একদিন এই আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবে। তিনি যা পারেন নি দীপু তাই পারবে। বাবা তাঁর অবসর সময়ে দলের কাজে ব্যস্ত। বাডীতেই দলের সভা হয়, রাজনৈতিক ক্লাশ হয়। দীপুর যখন বারো তেরো বছর বয়স হয় তখন তিনি ওকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। দীপুর ভাল লাগে না। ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাবা ওকে যে সকল দায়িত্ব দেন ও তা পালন করে না। বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে। একদিন মিথ্যা ধরা পড়ায় বাবা দীপুকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। কারণ আদর্শ নিয়ে ছেলেখেলা! এ সহ্য করা যায় না। দীপুর মন আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারে নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে পডে ওর শরীর খারাপ হতে থাকে। আস্তে আস্তে ফিটের উপসর্গ দেখা দেয়। একদিন কথায় কথায় দীপু অভিযোগ করেছিল যে ও কোন দিন ওর বাবার ভালবাসা পায় নি। বাবা তাঁর দলের ছেলেদের বেশি ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা গেছে যে মা-বাবারা তাঁদের সন্তানকে সব ব্যাপারেই তাঁদের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চান। শিশু বড হয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হবে, এ অবস্থাকে তাঁরা ভয় পান। সন্তানকে তাঁরা স্বাধীনতা দিতে ভয় পান, পাছে ওরা কখন কি করে বসে। পাছে সন্তান হাতছাডা হয়ে যায়, এই তাঁদের ভয়। প্রচণ্ড আগলে থাকার মনোবৃত্তি (Possessiveness) থেকেই এরূপ ব্যবহার তাঁরা করে থাকেন। তাই সন্তানকে তাঁরা সব সময় অক্ষম, অপটু ভাবতে ভালবাসেন।

ঘটনা নং ৯। মিঠু এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই মা সর্বদা হস্তক্ষেপ করেন, পাছে মিঠু কিছু ভুল করে ফেলে। কখন কি শাড়ী পরবে, কি ভাবে চুল বাঁধবে, কখন কি খাবে, কিভাবে ফোনে কথা বলবে, কতটা সময় পডবে, কোন্ কোন্ বন্ধুর সাথে মেলামেশা করবে, সব ব্যাপারেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি মিঠুকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চান। তিনি ওকে স্নান করিয়ে দেন ; শাড়ী পরতে সাহায্য করেন ; স্কুলে যাবার আগে নিজের হাতে খাইয়ে দেন, পাছে ওর গলায় মাছের কাঁটা আটকে যায়। শিশুকাল থেকেই মিঠু এভাবে মানুষ হয়ে আসছে। মায়ের আত্মপ্রসাদ, তাঁর মত এমন করে ভালবাসতে কেউ

পারবে না। একদিন তিনি রাগ করে বলেও ফেলেছিলেন মিঠুকে, "পড়তিস্ অন্য মায়ের পাল্লায়, বুঝতিস্ মজাটা।"

এখন আর মিঠুর এসব ভাল লাগে না। সে একটু স্বাধীন হতে চায়। একদিন অবস্থা চরমে ওঠে। স্কুলে যাবার আগে মা ভাতের থালা হাতে করে মিঠুর পিছনে পিছনে ঘুরে ঘুরে ওর মুখে ভাত গুঁজে দিচ্ছেন। কিছু ভাত খাওয়া হয়ে যাবার পর দুধের গ্লাস ওর মুখের কাছে ধরেছেন, ও খেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে খেতে হবে, নইলে ওর শরীর খারাপ হবে। তখন দু'জনেই ড্রইং রুমে। হঠাৎ মিঠু উত্তেজিত হয়ে ধাক্কা দিয়ে গ্লাসের দুধ ফেলে দিল। স্কুলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে অভূতপূর্ব দৃশ্য। মা কেঁদে আকুল "এত করি তোর জন্য, আর এই তোর প্রতিদান।" সেদিন আর মিঠুর স্কুলে যাওয়া হলো না।

চতুর্থতঃ দেখা গেছে যে মা অথবা বাবা যদি অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা মানসিক-রোগগ্রস্থ হন, তাহলে তাঁরা শিশুর সাথে প্রয়োজনীয় আবেগময় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বঞ্চনার বোধ আসা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ আজকাল শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরী করেন। অনেক সময় নিতান্ত বাঁচার প্রয়োজনেই দু'জনকে চাকরী করতে হয়; আবার অনেক সময় কেবলমাত্র সচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য অনেকে এরূপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি একান্নবর্তী পরিবার না হয় তাহলে শিশু অবহেলিত হতে বাধ্য। কারণ শিশুকে আত্মীয় অথবা কোনও অনাত্মীয় ব্যক্তির কাছে থাকতে হয়। কাজেই মা-বাবা যতই মনে করুন যে তাঁরা সন্তানের জন্য এত করছেন, এত কষ্ট করে চাকরী করে সচ্ছলতার মধ্যে তাকে মানুষ করছেন, সন্তান কিন্তু বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পায় না।

ষষ্ঠতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার স্বরূপ সন্তানের ভালবাসা পাওয়ার বোধকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মা ও বাবা উভয়ই হয়ত সন্তানকে যথেষ্ট ভালবাসেন; কিন্তু এই ভালবাসা নিয়ে দু'জনের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতি-যোগিতা সমস্ত পরিবেশকে আরও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। সংসারের ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এবং মতবিরোধ ও ঝগড়া সন্তানের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান এ যেন ত্রিভুজের তিনটি কোণ। এই তিনটি কোণের প্রত্যেকটি থেকেই প্রত্যেকটির দিকে সুসমঞ্জসভাবে আবেগের প্রবাহ থাকা দরকার। তাই এই ত্রিভুজাকৃতি সম্পর্কটিকে বিশেষ ভাবে একটি সমবাহু

ত্রিভুজের সাথেই তুলনা করে চলে। অর্থাৎ একটি সুসমঞ্জস অবস্থা। আবেগের বাহুগুলি পরস্পরের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অহেতুক দীর্ঘ, একটি অহেতুক হ্রস্ব নয়। ফলে এই সুসমঞ্জস আবেগের বাহু দ্বারা যে এক একটি সম্পর্কের কোণ তৈরি হয়েছে তাও পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ পরিবারে যদি সুসমঞ্জস আবেগের আবহাওয়া না থাকে, তাহলে শিশুর ভালবাসা পাওয়ার বোধে-হানি ঘটতে পারে।

এতক্ষণ যে সকল পরিস্থিতির আলোচনা করা হ'লো তাতে দেখা যায় যে সন্তানদের ধারণাই ঠিক, তাদের মনে বঞ্চনার বোধ জাগরিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুর প্রয়োজন, তার ভাল লাগা, তার মঙ্গল, মুখ্য নয়। ভালবাসার পিছনে মা-বাবার কামনা, প্রয়োজনবোধ, আকাঙ্খা ও অক্ষমতাবোধ গোপনে কাজ করে চলেছে। ভালবাসা এসকল ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক নয়, আত্ম-কেন্দ্রিক। মা বাবার এরূপ ভালবাসাকে আমরা আত্ম-প্রেম (Self-love) সঞ্জাত এবং স্বকামজ (Narcissistic) বলতে পারি। কাজেই এরূপ ভালবাসায় কখনওই শিশুর প্রয়োজন মিটতে পারেনা। তার মানসিক প্রয়োজন তো দূরের কথা, তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় ও বর্ত্তমান আলোচনায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মা-বাবার সাথে শিশুর বিকৃত সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ এক রকমের বঞ্চনা। একে আমরা ছদ্মবেশী বঞ্চনা বলতে পারি। আপাতঃদৃষ্টিতে একে ভালবাসা মনে হতে পারে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে বঞ্চনা ভালবাসার ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে, ভালবাসার মুখোশ ধারণ করে সকলকে ছলনা করার চেষ্টা করে। (একে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী Masked deprivation বলেছেন।) কিন্তু এ ছলনা শিশুর অনুভূতিতে ধরা পড়বেই। তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবার সান্নিধ্যই বড় কথা নয়। মা-বাবার সাথে শিশুর উপযুক্ত আবেগময় সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে একটি যথাযথ আবেগময় আবহাওয়া (emotional climate) শিশুর সুস্থ আবেগ জীবনের বিকাশের জন্য একান্ত দরকার। কিন্তু এই আবেগময় সম্পর্কের পূর্ণ বিকাশের জন্য সান্নিধ্য একটি পূর্ব-সর্ত।

এখন দেখা যাক মা-বাবার ভালবাসার অভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কিভাবে হানি ঘটায়। "The child's bodily contacts with his mothers and others who care for him, when counted one by one, run into tens of thousands. The contacts are significant from a psychological point of view. To

pick up an infant, to hold him in one's arms, to feed him, bathe him, and play with him means far more than just physical manipulations. In such event of this sort there is a communication between the adult and the child. It is largely through activities in which there is physical contact that the young child enters into interpersonal relationships with others, and from these he obtains nurture for his psychological development, much as the nourishment he gets through his mouth provides food for his physical growth." (Jersild, 1957). প্রথমে মায়ের এবং পরে মা-বাবা উভয়ের শারীরিক নৈকট্যের মধ্য দিয়েই শিশু তাদের ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করে এবং এভাবেই শিশুর মনে আবেগ-অনুভূতি প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই নৈকট্যের রকম-ফেরের মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা স্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান অনুভব করতে পারে। এর মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাব-মূর্তি গড়ে তুলতে থাকে। শিশু জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকে মায়ের সাথে তার শারীরিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে (কিছু পরিমাণে বাবার সাথেও) তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জগত, যেমন ভাল লাগা মন্দ লাগা, আরাম-বেদনা, গড়ে উঠতে থাকে। সে ক্ষুধার্ত হয়, মা তার ক্ষুধার অবসান ঘটান। সে বিছানা ভিজিয়ে থাকে, বা হয়ত কোন অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে, নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরামজনক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না; মা তখন তার অস্বস্তির অবসান ঘটান। খাওয়া, ঘুমনো, স্নান, পায়খানা, প্রস্রাব করা প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্যেই সে মায়ের স্পর্শ অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরামবোধ করে। কিন্তু মায়ের অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির সময়মত নজরের অভাবে শিশুর এই সকল প্রক্রিয়ায় যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তার মনে বিরূপবোধ জাগতে থাকে। শিশুর জীবনে এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতিই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর উপর ভিত্তি করেই তার বাইরের জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। শিশু ভাষা শেখার অনেক আগে থেকেই তার মনে এই বস্তু জগতের ধারণা (idea) সমূহ সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সকল ধারণাই তার ভাষার মূল উপাদান রূপে কাজ করতে থাকে। কাজেই প্রাক্-ভাষার স্তরের এই ধারণা সমূহে যদি অসামঞ্জস্য থাকে তাহলে তা শিশুর ভাষার ক্ষমতাকেও খর্ব করতে পারে। এই ধারণাগুলি গড়ে উঠতে থাকে তার জীবনের প্রাথমিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি (perception) ও অভিজ্ঞতার উপর। শিশুর আবেগজীবনের প্রভাব এর উপর অসামান্য। শিশুর নার্ভতন্ত্র পরিপক্ক থাকে না। ফলে এই সময়কার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি তার নার্ভতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি শারীর-সংগঠনের

উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শারীরবৃত্তের দিক থেকে নানা গবেষণায় দেখা গেছে (Hunt এবং Hebb-এর গবেষণা) যে শিশুর গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) উপর অতি শৈশবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্যই শৈশবের বেদনাদায়ক ও সুখদায়ক উদ্দীপকগুলি (stimuli) শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে শিশুর নার্ভতন্ত্র যখন কিছু কিছু উদ্দীপক গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে, অর্থাৎ শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে, তখনই উদ্দীপকগুলির প্রভাব শিশুর উপর বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। শিশু-প্রতিপালনের জন্য মায়ের ও বাবার বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপই এই উদ্দীপকের কাজ করে। এই উদ্দীপক সমূহের মাধ্যমেই শিশুর সাথে জগতের পরিচয় ঘটে। মা-বাবার ভালবাসার সাথে সুসমঞ্জস উদ্দীপকসমূহের একটা নিবিড় যোগাযোগ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। R. A. Spitz এবং W. Goldfarb-এর গবেষণায় ও শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের উপযুক্ত সংস্পর্শের অভাবের হানিকর প্রভাবের সমর্থন রয়েছে। Spitz এই হানিকর প্রভাবকে "anaclitic depression" (অর্থাৎ অন্য কোন বৃত্তি অচরিতার্থতাসঞ্জাত বিমর্ষতা বা অপর নির্ভরশীল বিমর্ষতা) নাম দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর শরীর-মনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানারূপ হানিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে J. Bowlby-র নাম স্মরণ করা দরকার। ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা Maternal care and Me ntal Health-এ তাঁর গবেষণা-লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তিকাটিই ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানির সমস্যাটির দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়। Bowlby এই পুস্তিকাটিতে লিখেছেন, "Prolonged breaks (in the mother-child relationship) during the first three years of life leave a characteristic impression on the child's personality. Clinically such children appear emotionally withdrawn and isolated. They fail to develop libidinal ties with other children or with adults and consequently have no friends worth the name." এই উক্তি থেকে দেখা যায় যে বঞ্চনার ফলে শিশু বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ মা-বাবার সাথে যেখানে যথাযথ সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে পাত্র-সম্পর্কের (object relationship) ক্ষমতাও ব্যাহত। মা-বাবার ভালবাসা ও সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে শিশু মা-বাবা সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলে। এই ধারণার রকম-ফেরের উপরই তার পরবর্তীকালের অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে ধারণাগুলি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াটি শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত অল্প-বিস্তর চলতে থাকে। কাজেই এই সময় ভালবাসার ক্ষেত্রে অবহেলা বিশেষ

হানিকর। ভালবাসায় বঞ্চনার জন্য পাত্র-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সম্বন্ধে গবেষণার প্রসঙ্গে Anna Freud এবং S. Lebovici-র (বর্তমান সভাপতি, আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতি) নামও উল্লেখযোগ্য।

শিশু যখন আর একটু বড় হয় এবং এই সময় সে যদি ভালবাসায় বঞ্চিত হয় তাহলে সে তার ভালবাসার চাহিদাকেই ভুলে যেতে চায়। ভালবাসা চেয়ে না পাওয়ার হতাশাজনক পরিস্থিতিকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। ফলে সে ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছাকেই দমন করে। সে বলে, "আমি কারুর ভালবাসা চাই না।" এইভাবে তার অন্তরে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে পাওয়ার ইচ্ছা, আর একদিকে সেই ইচ্ছাকে দমন। এই দ্বন্দ্ব থেকে তার নানা মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। এরূপভাবে নানা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মা-বাবার ভালবাসা আকর্ষণ করার একটা প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। হিষ্টিরিয়া রোগের কোন কোন অবস্থার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যেমন হীনমন্যতাবোধ, সব সময় বিরক্তিভাব, উন্নাসিকতা, এমন কি নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। আবেশিক উদ্বায়ু- (obsessional neurosis) রোগের রোগীদের মধ্যে যে অনেক সময় অত্যধিক আক্রম বোধ (exaggerated aggression) অত্যধিক ঈর্ষা, অত্যধিক ঘৃণা ইত্যাদি দেখা যায় তার পিছনেও অনেক সময় রোগীর শিশু বয়সে ভালবাসা পাওয়ার বোধে অভাবের অবদান দেখা গেছে। কোনও শিশু যদি প্রথমে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পায়, এবং পরে যদি সে তার থেকে বঞ্চিত হয় (যা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়; যেমন, মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার পর প্রথম শিশুর প্রতিক্রিয়া) তাহলে তার মধ্যে একটা অত্যধিক ঘ্যানঘ্যানানি ও বিরক্তিবোধের প্রকাশ দেখা যায়। শিশুর জীবনে মা-বাবার ভালবাসায় আস্থাবোধ তার নিরাপত্তাবোধের জন্য একান্ত দরকার। এই আস্থার অভাব হলেই শিশুর মনে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ দেখা দিতে থাকে, এবং ফলে তার মনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

মানবেতর প্রাণীর শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। প্রাণীধারার নিম্ন ধাপ থেকে যতই উচ্চ ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে শৈশবকাল ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। মানবশিশুর শৈশবকাল দীর্ঘতম। "এই দীর্ঘতম শৈশবকাল ও পরনির্ভরতা পরস্পর সম্বন্ধিত। পতঙ্গ-শিশুর চাইতে মানবশিশু যে কত অসহায় তা আমরা এই দুই শ্রেণীর জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।...... নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের

প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল বলতে কিছুই নেই, অথবা শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। পতঙ্গ এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের জন্মের সাথে সাথে জীবনধারণের উপযোগী কতকগুলি ক্ষমতা থাকে। যেমন, ধরা যাক আহার সংগ্রহের ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের (reflex) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকগুলির সাহায্যেই তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনসমূহ মেটে। বাইরের পরিবেশে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটলেই এই প্রতিবর্তকগুলি আর সহায়তা করতে পারে না। এবং তারা নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন প্রতিবর্তক বা অন্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে না। তখন তাদের ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য।"

কিন্তু মানবশিশুর বেলায় জন্মের সাথে সাথে এরূপ স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অস্তিত্ব খুবই কম। এমন কি বাইরের সাধারণ উদ্দীপকের ফলে (আত্মরক্ষার নিমিত্ত) চোখের পাতা পিট্‌পিট্‌ করার প্রতিবর্তক আয়ত্ত করতেও তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়। কাজেই সে জীবনধারণের প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই পরনির্ভরশীল। এই কারণেই মানবশিশুর দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার সহজাত ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।"

মানবশিশুর ক্ষেত্রে একদিকে শরীর যন্ত্রে অপর্যাপ্ত স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অভাব, অপর দিকে মা-বাবার ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ব্যবস্থা,—এই অবস্থার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের অফুরন্ত সুযোগ। এই অবস্থার মধ্যে থেকে মানবশিশু ধীরে ধীরে তার বিচিত্র পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নানা রকমের প্রতিবেদন (responsc) আয়ত্ত করতে থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি-বেদনের ক্ষেত্রে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে।......এর ফলে সে ধীরে ধীরে জীবনযুদ্ধে নিজেকে বেশি উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। ....
... .

এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এরূপ নমনীয়তাই তো মানব জাতির জীবন সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন। কাজেই মানবশিশুর প্রতিবর্তকহীন অসহায় অবস্থা ও দীর্ঘায়ত শৈশবকাল বিবর্তনের দিক থেকে মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু এও নিঃসর্ত নয়। অসহায় ও দীর্ঘায়ত শৈশবকালের সাথে যুক্ত রয়েছে মা-বাবার ভালবাসা ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়। এই নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই মানব-শিশু তার শৈশবকালে বিচিত্র পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পায়। তাই যে অসহায় শৈশবকাল মানবজাতির পক্ষে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, তাই আবার অভিশাপে পরিণত হতে পারে যদি তার আনুসঙ্গিক

সর্ত যথাযথভাবে পরিপূরণ না হয়। পরিবারের আশ্রয় ও মা-বাবার ভালবাসার ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে মানবশিশুর অবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার দিক থেকে পতঙ্গের চাইতেও নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য-হীনতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি প্রতিবেদনই তখন নিরাপত্তাবোধের অভাব দ্বারা প্রভাবিত। এইভাবে সে অস্বাভাবিক প্রতিবেদনের উৎপাদন ঘটাতে থাকে এবং ক্রমে মানসিক-রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। "(লেখক ; চিত্ত, ১ম, ১৩৮০।)
"Childhood is......at once the greatest achievement and the greatest risk of evolution : it carries with it the greatest potentialities of development, but also the greatest possibility of disaster." (Hadfield, 1952)।

আমাদের সামনে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে যে শিশুর মানসিক-স্বাস্থ্য গঠনে মায়ের অবদান বেশি, না বাবার অবদান বেশি ? না উভয়ের অবদানই সমভাবে প্রয়োজন ? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকান দরকার। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালবাসা ও কর্তব্য-বোধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা একটু দেখা দরকার। মানুষ একটি সমাজবদ্ধ ও পরিবারবদ্ধ জীব। এবং পরিবারই (family) হ'ল সমাজের নিম্নতম একক। এই পরিবারের স্বরূপ ও সংগঠন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের ছিল। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ বলে থাকেন যে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পূর্বপুরুষ মানবাকার (anthropoid) প্রাণীর (বনমানুষ) কাছ থেকেই এই পরিবার-বদ্ধতার জীবনবোধটি লাভ করেছে। এই বোধটি মনুষ্য পর্যায়ে এসে আরও দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। এবং রূপান্তরিত হয়ে, অর্থাৎ এই বোধটি কেবলমাত্র সহজ প্রবৃত্তির (instinct) আওতায় না থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির (culture) আওতায় এসে পড়েছে। যা ছিল কেবল মাত্র সহজাতপ্রবৃত্তি তা সভ্যতার আওতায় এসে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় হ'ল। এরূপ সংঘবদ্ধ জীবন-ধারার মধ্যে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অপর সকল ব্যক্তির জীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়, বিশেষ করে শিশুর মায়ের জীবনে সহজাতপ্রবৃত্তি ও পরিবারবদ্ধ জীবনের আনুসঙ্গিক বোধ, কর্তব্য চেতনা দ্বারা এই পরিবর্তন প্রভাবিত। গর্ভাবস্থা থেকেই ভাবী মায়ের জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের কিছুটা শারীরিক অপটুতা ও পরনির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর পর শিশু জন্মাবার পরে তার শরীরযন্ত্রে আরও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নতুন প্রতিবেদনও দেখা যায়। শিশু ও মায়ের পরস্পরের প্রতি প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। পরস্পরের প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। মা সন্তানকে নিরীক্ষণ করে, আদর করে, বুকের দুধ পান করিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলে। সন্তানও এর প্রত্যুত্তরে

যথাযথ প্রতিবেদন দেখায়। এ একেবারে প্রশ্নাতীত প্রবৃত্তিবেগ। কাজেই মা ও শিশুর সম্পর্ক একটা দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্ক যতই দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত হোক না কেন, প্রতিটি মনুষ্যসমাজে এ সম্পর্কের উপর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়; যেমন প্রতিটি সমাজেই গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মাবার পর পর্যন্ত মাকে নানা ভাবে নানা রকমের টাবু (taboo) মেনে চলতে হয়, নানা রকমের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোথাও এসকল ধর্মীয়, কোথায় নীতিগত, কোথাওবা স্বাস্থ্যবিধি-সম্পর্কীয়। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে মা ও শিশুর সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির হস্তক্ষেপও প্রবল। এই হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হয়। এই হস্তক্ষেপের মধ্যে শিশুর মঙ্গলবিধান এবং মায়ের মনকে শিশুর প্রতি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যও পরিলক্ষিত হয় এবং মায়ের প্রবৃত্তিসমূহকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ও মায়ের সম্পর্কের ভিত্তি প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত। এই সম্পর্কের যথাযথ রূপায়ণের মধ্যে শিশুর মঙ্গলময় বিকাশ বিধৃত। ভাল-বাসার সূত্রে উভয়ের সম্পর্ক গ্রথিত। কাজেই ভালবাসার বঞ্চনা শিশুর বিকাশে বাধা স্বরূপ।

মা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, বাবা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি তেমন দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়? পিতা-ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কি কোনও সহজাত প্রবৃত্তি নেই? সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব প্রাণীধারার যে স্তরে বিন্দুমাত্র নেই, অর্থাৎ মানবেতর উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মা-প্রাণীটির গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে শাবক জন্মাবার পরও কিছুদিন পুরুষ প্রাণীটি সঙ্গী হিসাবে থাকে। এই পুরুষ প্রাণীটিই তখন মা ও শিশুর আহার সংগ্রহ, রক্ষণা-বেক্ষণ, শিশুর শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। আসলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীটির এই জোড়-বাঁধা অবস্থা তাদের সঙ্গম-কাল (mating period) থেকে শুরু হয়। এদিক থেকে পরস্পরের প্রতি যে কোমল আবেগ ও আকর্ষণ তার ভিত্তিস্বরূপ একটি দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত দিক দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গিনীর প্রতি এই সহজাত আবেগধারাই কালক্রমে সন্তানের প্রতি বর্ধিত হয়। কাজেই পুরুষ ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে পরোক্ষ-ভাবে একটা সহজাত প্রবৃত্তিগত দিক রয়েছে যা এর ভিত্তিস্বরূপ। পুরুষ প্রাণীটি এই সহজাত আকর্ষণের ফলেই শিশু-প্রাণীটিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, আহার সংগ্রহ করে দেয়, হাঁটা-চলা, শিকার করা, ওড়া, আত্মরক্ষা করা শেখায় এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

মনুষ্য সমাজেও দেখতে পাই যে পুরুষ তার সঙ্গিনীর সাথে থাকছে (বিবাহের মধ্য দিয়ে যা সম্পন্ন হয়)। গর্ভাবস্থায় তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নিচ্ছে। সঙ্গিনীর সাহচর্যের মধ্য দিয়ে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও কোমল অনুভূতিধারা বিকশিত হতে থাকে। এই আকর্ষণ ও অনুভূতি ধারাই সন্তানের প্রতি বর্ধিত হয়। "Once a man is made to remain with his wife to guard her pregnancy, to observe the various duties which he usually has to fulfill at birth, there can be not the slightest doubt that his response to the offspring is that of impulsive interest and tender attachment."

"It seems to me that the only factors which determine the sentimental attitude in the male parent are connected with the life led together with the mother during her pregnancy." (Malinowaski, 1953)। এরপর সামাজিক অনুশাসন, নীতি-বোধ, নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও টাবু এই অনুভূতিকে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় করে তোলে। অর্থাৎ যা ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতি-দত্ত ও সহজাত, তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির আওতায় এসে আরও স্থিরনির্দিষ্ট ও দৃঢ় হলো। এখনও এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মায়ের গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের সময় বাবাকে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান ও টাবু মেনে চলতে হয়। এমন কি বাবার মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করা হয় যার ফলে গর্ভাবস্থার ও প্রসবক্ষণের সকল শারীরিক ও মানসিক উপলক্ষণগুলি সে অনুভব করতে থাকে। এরূপভাবে বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা শরীরগত ও প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে মায়ের সাথে সন্তানের একটা প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্ক এবং তার থেকে উৎপাদিত একটা প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। যদিও পরোক্ষভাবে আমরা একটা প্রবৃত্তিগত সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখতে পাই। উভয় ক্ষেত্রেই সভ্যতা-সংস্কৃতি এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে তুলছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মূল উপাদান হিসাবে কিছুটা সহজাত প্রবৃত্তি না থাকলে কেবল মাত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা এমন একটা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হতো না। সভ্যতা-সংস্কৃতি কেবল সংস্কৃতই করতে পারে, কিন্তু তার মূল উপাদান চাই।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে যুগ যুগ ধরে প্রবৃত্তি ও সভ্যতা মিলে-মিশে মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই কারণেই মা, বাবা ও সন্তান এই তিন নিয়ে পরিবার। এর যে কোন একটিকে বাদ দিলে

পরিবারের সম্পূর্ণতায় ত্রুটি থেকে গেল। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে এর একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এমন কোন কালও পরিলক্ষিত হয় নি যখন একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছিল। এই জন্যই মা, বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক একটি সমবাহু ত্রিভুজের সাথে তুলনীয়। সকলেরই সমান স্থান, সম উপযোগিতা। সন্তানের জীবনধারণ ও মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবার, উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পুরুষ ও নারীর আত্মবিকাশ ও অনুভূতির উপলব্ধির জন্য শিশুর অস্তিত্বের প্রয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার এমনই একটি সংস্থা যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের আত্মবিকাশ সম্ভব। অবশ্য পরিবারের রূপ কি রকম হবে তা অন্য কথা।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশু কিছুটা বড় ও আত্মনির্ভরশীল হলেই মা, বাবাও শিশুর একত্রে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাদের ভিতরের সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। মানুষ তখনও এই সম্পর্ককে অটুট রাখে। কারণ মানুষের অস্তিত্বের জন্য এটা প্রয়োজন। তার সামাজিক আত্মবিকাশের জন্য এটা প্রয়োজন। পরিবার নামক সংস্থার মধ্য দিয়েই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই মানব পরিবার অটুট থাকে। এইভাবেই মানুষ তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে।

শিশু জন্মাবার পর মুহূর্ত থেকেই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মায়ের উপর নির্ভরশীল। এখানেই মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সমধিক। এই নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি শিশুর একটা আকর্ষণ, একটা আঁকড়ে থাকার মানসিক ভাব জন্মায়। শিশুর এই নির্ভরশীলতা (বুকের দুধ খাওয়া ইত্যাদি) অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মায়ের প্রতি এই আসক্তি বজায় থাকে। কিন্তু এই আসক্তি তার সামাজিক বিকাশ ও আত্মবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। এই সময় মা ও বাবাকে শিশুকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের নিজ নিজ অবদান নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। শিশুর পক্ষে যেখানে মা-বাবার শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শেষ সেখানে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার শুরু। শিশুকে এই সময় শিখতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে নতি, শ্রদ্ধা ও বিনম্রতা। শৈশবে মা, বাবা ও ভাই-বোনের সাথে শরীরগত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি যে আকর্ষণ ও আসক্তি জন্মায় তাকে পরিমার্জিত করতে হয়। এ কাজ তার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বিরোধী। অর্থাৎ এক কথায় তার সমস্ত কামশক্তি (libido) পরিমার্জিত ভাবে নতুন খাতে প্রবাহিত করার শিক্ষণ পেতে হয়। এই শিক্ষণের ক্ষেত্রে মা ও বাবার নিজ নিজ দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। যে ইডিপস সংস্থিতি (Oedipus situation) ও অজাচার ইচ্ছার (incest desire) জন্ম পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সাহচর্যে, তার নিষ্পত্তিও হয়

পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সহায়তায়। এই কঠিন কাজ সম্পন্ন হয় মা-বাবার যথাযথ ভালবাসার পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে। এর উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে শিশুর শৈশব কালের ও পরবর্তী কালের মানসিক সুস্থতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর কাছে 'মা হয়ে আছে আদর, আবদার, কমনীয়তা প্রভৃতির প্রতীক; আর বাবা হয়ে আছে ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা, ক্ষমতা, উচ্চ আকাঙ্খা প্রভৃতির প্রতীক। এই দুইয়ের যথাযথ সমন্বয়ে পূর্ণতা।

মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক জন্ম মুহূর্ত থেকে। শিশুর শারীরিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবে মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসার বিকাশ হয়। মায়ের সাথে শিশুর এইভাবে একটা চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। এই চাওয়া আস্তে আস্তে বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে নানা মানসিক-বোধের সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। সে মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা, স্নেহ, প্রশংসা প্রভৃতি চাইতে থাকে। এই সকলের 'পাওয়ার' মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা বাড়তে থাকে। কিন্তু বাস্তব কারণেই, শিশুর মঙ্গলের জন্যই, সকল চাওয়ার পরিপূর্তি মায়ের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। যখন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই শিশু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুকে এই সময়ই শিখতে হবে তার নিজের ক্রোধ, ঘৃণা, কামনাকে সংযত করার কৌশল। এই শিক্ষণ কাজে মায়ের ভালবাসাই তার সহায়। মায়ের ভালবাসার জন্যই তাকে কামশক্তিকে সংযত করে ভবিষ্যৎ সুস্থ ব্যক্তিত্বের সোপান তৈরি করতে হয়। শিশুর জীবনের এই দোদুল্যমান মুহূর্তে মায়ের যথাযথ ভালবাসা তাকে পথ চলতে সাহায্য করে। এই ভালবাসার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা বঞ্চনা থাকলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে।

শিশুর জীবনে বাবার প্রকৃত আবির্ভাব ঘটে কিছু পরে; শিশুর জন্মের প্রথম বছরের শেষের দিকে। তার জীবনে বাবা আবির্ভূত হয় যেন শৌর্য-বীর্যের মূর্তি ধারণ করে। বাবাও যে তার বস্তু চাহিদা মেটাচ্ছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। তার মায়ের সমস্ত কর্ম-শক্তির পিছনে যে তার বাবার উপস্থিতি কাজ করছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। যে রথে চড়ে সে এই পার্থিব ভোগের কাজে যাত্রা করেছে, তার যে দুটি চাকা, মা ও বাবা, এটা আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার উপলব্ধি হয়। কিন্তু বাবার সাথে এই পরিচয়ের মুহূর্তে শিশু আবার একটি ধাক্কা খায়। সে দেখে বাবা তার ভোগের অংশীদার। এমনকি মায়ের ভালবাসায়ও সে ভাগীদার। এবং সে তার অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। কাজেই বাবা সম্পর্কে শিশুর মনে (বিশেষ করে ছেলে) একটা ভয়, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিমোহিত ভাব দেখা দেয়। কাজেই বাবা শিশুর কাছে যেন একটু দূরের

মানুষ থেকে যায়। এই দূরের মানুষকে কাছে করে নেওয়ার জন্যই শিশু মনশ্চিত্র প্রক্রিয়ার (phantasy activity) আশ্রয় নেয়। সে বাবার মত হতে চায়, তাকে অনুকরণ করে। এই সময় শিশুর জীবনে মায়ের থেকে বাবার অবদান বেশি। শিশুর সংযত সামাজিক বোধের বিকাশে বাবার অবদান অসামান্য। "What the mother does in this respect in minute-to-minute and day-to-day criticizing, praising and guiding, the father normally re-inforces by his very presence." (Burlingham & Freud, 1947). কামশক্তিকে দমন করে ঠিক পথে চলতে বাবা তাকে সাহায্য করে। এই জন্যই একটি পিতৃহীন, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ কিশোর বয়সের ছেলেকে বার বার বলতে শোনা গেছে, "আমার ছোটবেলা আমাকে শাসন করার কেউ ছিল না, আমাকে যা খুশি তাই করতে দেওয়া হয়েছে, আমাকে কেউ শাস্তি দেয়নি ; সেইজন্যই আমার আজ এই দশা !" ছেলে-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেই বোধ হয় বাবার অবদান বেশি। একদিকে বাবা যেমন তার সুখ উপভোগের সহায়ক, অপর দিকে সে বাধাস্বরূপ, বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে। এই উভয়বিধ পরিস্থিতি শিশুর মধ্যে বাবার প্রতি একদিকে একটা গোপন বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলে অপর দিকে বাবাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির (identification) সাহায্যে এই জটিল পরিস্থিতির একটা মীমাংসা করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার রাস্তাকে সুগম রাখে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করে বাবার ভালবাসা পাওয়া এবং তার প্রতি বাবার যথাযথ ব্যবহারের উপর। এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটলে শিশুর ব্যবহারে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেবে। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাবার ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে মা তার অংশীদার হয়ে দেখা দেয়। আবার মা'ই তার প্রাত্যহিক সুখ উপভোগ মেটাচ্ছে। কাজেই মায়ের প্রতি তার গোপন ঘৃণা ও ভালবাসা পাশাপাশি দেখা দেয়। কিন্তু সেও এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারসাম্যতা আনে মাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির সাহায্যে। এও নির্ভর করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার বোধ ও শিশুর প্রতি তার যথাযথ ব্যবহারের উপর। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে একটি শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবা উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। এখানে বেশি-কমের প্রশ্ন নেই ; কারণ যে কোনও একজনের অবদানের অভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। আর এই অপূর্ণতাই স্বাস্থ্যহীনতা।

শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হলো মাত্র। তবে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে মা-বাবার ভালবাসা কারণস্বরূপ বিরাজ করে। কাজেই শিশুদের প্রতি মা-বাবার সংযত

আচরণ, তাদের প্রতি বয়স্কদের উপযুক্ত আচরণ সুস্থ সমাজ-গঠনের সহায়ক। মনে হয় সেই আদিম কাল থেকে মানুষের সমাজে মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে শিশু-পালনের বিচিত্র ধারা। আজ মনোবিজ্ঞানীদের ভাবার সময় এসেছে এই সম্পর্কের কোন্ রূপটি যথাযথই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর এবং সেটি লাভের সহজতম উপায়ই বা কোন্‌টি।

সহায়ক পুস্তকসমূহ

১। Deprivation of Maternal care
—World Health organization, 1962.

২। Infants without families.
—Burlingham and A. Freud, 1947.

৩। Child Psychology,
A. T. Jersild, 1957

৪। Comprehensive Text book of Psychiatry, Ch. 44
—Editors —Freedman & Kaplan, 1967

৫। Primitive Society.
—Lowie, 1953.

৬। Sex and Repression in Savage Society,
—Malinowaski, 1953.

৭। Psychology and Mental Health
—Hadfield, 1952

৮। Fatherless Children
—Susan Isaacs & etc. 1945.

৯। Maternal care and Mental Health
—Bowlby, 1951.

১০। Child care and the Growth of Love
—Bowlby, 1945.

১১। Mental Health and Hindu Psychology
—Swami Akhilananda, 1952.

ঔপন্যাসিক লরেন্স ও ফ্রয়েড

অমল শঙ্কর রায়

ডি এইচ লরেন্সের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপন্যাস 'সনস্ এণ্ড লাভার্স' (Sons and Lovers) পড়লে সাধারণতঃ মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রন্থটি কি ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণের প্রভাবেই রচিত ? তার কারণ, এর গল্পাংশের ভিতর ঈডিপাস্ মানসকূটের এক আশ্চর্য শিল্পরূপ বিকাশ লাভ করে বলে আমার ধারণা। উপন্যাসের নায়ক পল। পল এর পিতা মদ্যপ ও বদ্‌রাগী আর সামান্য কারণেই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করেন। এজন্য পল-এর মাতার বিশেষ দৃষ্টি তাঁর সন্তানদের প্রতি ও তাদের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি সর্বদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। আর সন্তানেরাও মায়ের প্রতি প্রবলভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করা যায়, এ মোহের প্রবলতম রূপ দেখা দেয় পল ও তার মায়ের আকর্ষণের ভিতর।

লরেন্সের জীবনীকারেরা বলেন লরেন্সের জীবনেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দেয়। লরেন্সও বাল্যজীবনে তাঁর পিতাকে তাঁর মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দেখেন ও সেজন্য পিতার প্রতি তাঁর মনে বৈরীভাব জন্মায় আর মাতার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকর্ষিত হন। বস্তুতঃ ঐ আকর্ষণ এত তীব্র প্রকৃতির ছিল যে যতদিন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন লরেন্স কোন রমণীকে বিবাহ করতে অসম্মত হন। যতদুর জানা যায়, তিনি স্পষ্টতঃই বলেন যতদিন তাঁর মা জীবিত আছেন ততদিন তাঁর পক্ষে কোন নারীকে বিবাহ করে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একটি নারী লরেন্সের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন কিন্তু লরেন্স তাতে সম্মত হন নাই। পরে তাঁর মাতার মৃত্যু হলে তিনি অপর একটি নারীকে বিবাহ করেন।

যতদুর জানা যায়, লরেন্স যখন উক্ত উপন্যাসখানি লিখতে শুরু করেন তখন পর্যন্ত তিনি ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন বই পড়েন নি। কিন্তু উপন্যাসটি রচনার সময় অথবা সেটা প্রকাশ করার কিছুকাল পুর্বে তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। এ পরিচয়ের মুলে বিদ্যমান তাঁর প্রণয়িনী ফ্রিডার

প্রভাব। ফ্রিডা ফ্রয়েডের চিন্তাধারাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেন। তিনি দিনের পর দিন লরেন্সের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার ফলে লরেন্সের ভিতর ফ্রয়েডের চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল করে পরিচয়-লাভের ইচ্ছা দেখা দেয়। তিনি তখন ফ্রয়েডের গ্রন্থগুলি মূল জার্মান ভাষায় পড়েন।

সুতরাং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব লরেন্স-রচিত উক্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঠিক কি ভাবে ও কতখানি মাত্রায় প্রভাবশালী হয় সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলব, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভের ফলেই হোক বা লরেন্সের মানস-প্রদেশে তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ক্রিয়াশীলতার প্রভাবেই হোক, ঐ উপন্যাসে ঈডিপাস্ মানসকূটের শিল্পাশ্রিতরূপ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হওয়ার পর লরেন্স লক্ষ্য করেন তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা মিল সেটা ব্যক্তির যৌন-শক্তি অবদমনের কুফল সম্পর্কে। উভয়েই অভিমত প্রকাশ করেন যে যৌনেচ্ছার তৃপ্তি ঘটানো, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানসিক সম্পদলাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা ঘটাতে পারে। তবে যৌনবৃত্তির প্রকাশ জীবনে সর্বপ্রথম কোন স্তরে দেখা দেয় সে বিষয়ে দুই চিন্তাবিদের মত বিভিন্ন। ফ্রয়েডের মতে এর অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তির শৈশব-কালে সর্বপ্রথম আঙ্গুল চোষা, কামড়ানো, চিবানো প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ করে, তার-পর মল-নিঃসরণ বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আনন্দলাভের ভিতর দিয়ে ও পরিশেষে লৈঙ্গিক ব্যবহারজনিত সুখলাভের মাধ্যমে। কিন্তু লরেন্স বলেন শিশুর ভিতর যৌনবৃত্তির রূপ বিদ্যমান থাকতে পারে না, জীবনে এ প্রকাশ সর্বপ্রথম দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালে। এছাড়া যৌনশক্তি তৃপ্ত হলে তার ফলে মনের ভিতর যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার রূপও দুই চিন্তাবিদের মতে ভিন্ন প্রকৃতির। ফ্রয়েড মনে করেন যৌনেচ্ছা তৃপ্ত হলে ব্যক্তির ভিতর স্বভাবী মানসিকতার রূপ বিকাশ লাভ করতে পারে। মনো-বিশ্লেষনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন বহু স্থলে ঐ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকার দরুণ সেটা অদ্ভুত ধরণের সংবদ্ধতার (Fixation) রূপ পরিগ্রহ করে, নয়ত সেটা যৌনবিকৃতি বা অপচার রূপে (Perversion) দেখা দেয়। এছাড়া তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির অস্বভাবী মানসিকতার ভিতর শৈশবকালীন কোন ইন্দ্রিয়সুখমূলক কামনার বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু সে সম্পর্কে সাধারণভাবে বিচার করলে মানুষ কিছুই জানতে পারে না। তার কারণ ঐ অঙ্কুরের কেন্দ্রস্থল সচেতন মনের ভিতর নয়,—মনের অবচেতন (Unconscious mind) প্রদেশে। এ বিষয়ে ফ্রয়েড

আশার কথাও বলেন। তিনি বলেন অবচেতনের উপাদানকে মনের সচেতন প্রদেশে আনতে পারলেও পরে বাস্তব বোধের-(Ego) শক্তির প্রয়োগ ঘটালে অবচেতনের অনিষ্টকর প্রভাবকে লুপ্ত বা স্তিমিত করে ফেলা সম্ভব হতে পারে। তবে কোন কোন স্থলে ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের উন্নয়ন (Sublimation) ঘটাতে সক্ষম হয়। ফ্রয়েড বলেন এ এক ধরনের প্রতিরক্ষণ-কৌশল (Defence-Mechanism) ও এ ধরনের ক্রিয়াশীলতা অবলম্বন করে মানুষ অবচেতনের অনিষ্ট-কর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

লরেন্সের মতে যৌনবোধের তৃপ্তি ঘটলে মানুষ মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক মানসিক সম্পদের সন্ধান পান। তবে ঐ যৌনেচ্ছা পুরণের ক্ষেত্রে কোন অপরাধ-বোধের স্পর্শ থাকা চলবে না। আর এস্থলে যৌনবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও থাকা চাই। কিন্তু এ সম্পদ যে ঠিক কি ধরনের সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট অভিমত লরেন্স দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি ঐ সম্পদকে বাস্তবতা (Reality)-নামান্তর বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এ এক রহস্যময় ('mysterious') শক্তিবিশেষ। মনের গভীরে এর অবস্থান এক আনন্দময় সত্তা রূপে। মনে প্রশ্ন জাগে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করলে এর স্বরূপ মেলে কি? কোন সমালোচক বলেন লরেন্স মূলতঃ একজন কবি ও একথা মনে রেখেই তাঁর সাহিত্যকে বিচার করা সমীচীন। এজন্য লরেন্স-কথিত মানসিক সম্পদকে তাঁর কবিপ্রতিভানিঃসৃত এক চিত্রকল্পের রূপ বললে বোধ করি ভুল হয় না। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ইয়ুং-প্রবর্তিত অ্যানিমা (Anima) নামক প্রতিরূপের কথা। কিন্তু অ্যানিমার সঙ্গে লরেন্স-কল্পিত ঐ মানসিক সত্তার প্রভেদ আছে। তার কারণ, অ্যানিমা শুধু আনন্দময় নয়, এর ভয়ঙ্করীরূপও দেখা দেয়। কিন্তু লরেন্স-কল্পিত মানসিক সম্পদ শুধুই আনন্দমূলক।

তবে লরেন্স-কল্পিত মানসিক সম্পদ বস্তুতঃ কি ধরনের মানসিকতার বিকাশ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করতে হলে তাঁর 'দি লষ্ট গার্ল' (The Lost Girl) নামক উপন্যাসের নায়িকার উপলব্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে তা থেকে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করা যাক। আলভিনা সুন্দরী ও শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী। সে কয়েকটি তরুণের সাহচর্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাদের কারোও সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। পরিশেষে তার ভিতর প্রণয়মূলক আসক্তি জন্মায় এক দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত ইটালীদেশীয় যুবকের প্রতি। যুবকের নাম সিসিও। আলভিনা সিসিওকে বিবাহ করে। বিবাহের পরে তারা ইটালীতে সিসিও-র বাড়ীতে বাস করে। দরিদ্রের সংসার। যে পরিবারে আলভিনা লালিত-পালিত হয় সেটা এ থেকে ভিন্ন ধরণের। সেজন্য আল-

ভিনাকে নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যৌনসম্পর্ক ও মনের মিল ছিল আশ্চর্য ধরণের। লরেন্স বলেন আলভিনার ভিতর প্রবৃত্তিগত নিম্ন-মানের সত্তার (Lower Self) চাহিদা তৃপ্তিলাভ করার ফলে তার উচ্চমানের সত্তার (Higher Self) বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। মনে হয় এরই দরুণ তার ভিতর এক আশ্চর্য ধরনের প্রশান্তি দেখা দেয়। তার ভিতর না ছিল অতৃপ্তিমূলক মনোভাব, না ছিল কোন চাঞ্চল্য বা দ্বন্দ্ব। আলভিনা যেন বাস করে এক কামনার অলকাধামে। লরেন্সের ভাষায় ঐ অবস্থায় তার ভিতর সত্যকার ব্যক্তিসত্তার ('Real Self') উপলব্ধি জন্মায়। লরেন্স একে শোণিতের জাগরণ ('Blood Consciousness') বলেও আখ্যা দেন। লরেন্সের মতে এ ধরনের উপলব্ধি আর্থিক সচ্ছলতা বা প্রাচুর্য অথবা বুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চাই গভীর প্রেমানুভূতির স্পর্শ ও যৌনেচ্ছার তৃপ্তি সাধন। মনে হয় এ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক অভিমতের মিল আছে। ফ্রয়েডও যৌনচাহিদার তৃপ্তিসাধনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে তিনি বলেন অনেক ক্ষেত্রে মনের গভীরে প্রতিকূল মানসিকতার রূপ অবদমিত থাকার দরুণ স্বাভাবিক প্রেমবোধ বিকাশলাভ করতে ব্যাহত হয় ও মনঃ-সমীক্ষণের পদ্ধতি অনুসারে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ স্বভাবী মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা যায়।

মনে হয় লরেন্স ও ফ্রয়েড যে যৌনেচ্ছা পূরণের প্রাধাণ্যের কথা বলেন, এ ধরনের অভিমতে হিন্দুদের চিন্তা-দর্শনের সমর্থনও মেলে। হিন্দুদর্শন দাম্পত্যজীবনের যৌনমূলক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। লরেন্সের মতে কামপ্রবৃত্তি দেহ ও মনোগত এক বিশিষ্ট ধরনের উপাদান, ফ্রয়েড একে জৈবশক্তির একটি দুর্বাধ প্রকৃতির অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেন ও হিন্দুদর্শন যৌনবৃত্তির আধিক্যকে একটা রিপু বলে আখ্যা দেয়। সুতরাং এ শক্তির সঙ্গে একটা মীমাংসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে যে অগ্রাহ্য করা চলেনা এ ধরণের অভিমত তিনটি চিন্তাদর্শনই পোষণ করে।

লরেন্সের মতে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্নপ্রকৃতির। পুরুষের কর্মক্ষেত্র মূলতঃ বহির্জগতে সম্প্রসারিত ও নারীর প্রধান কাজ পুরুষকে ঐ কাজে সহায়তা করা। পুরুষের ভিতর যে শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে নারীর নিবিড় সাহচর্য লাভ করে পুরুষ ঐ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। সুতরাং লরেন্সের মতে, সভ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের ভূমিকাই সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্রয়েড মূলতঃ মনোবৈজ্ঞানিক। তিনি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেন। ফ্রয়েড বলেন মানুষ বস্তুতঃ উভকামী (Bisexual) অর্থাৎ পুরুষের ভিতর

নারীসত্তা ও নারীর ভিতর পুরুষসত্তা বিদ্যমান ও তিনি মনে করেন পুরুষ ও নারীর ভিতর যে বিপরীত সত্তা বর্তমান, সেগুলি মনের অবচেতনে অবদমিত হয়ে থাকলে তার ফল মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে তিনি ঐ অবদমিত ব্যক্তিসত্তার স্বভাবী প্রকাশ ঘটাতে চান। এছাড়া নারী পুরুষের ভিতর স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি হলে সেটা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হতে পারে এমন মতও তিনি পোষণ করেন।

ফ্রয়েড ও লরেন্স উভয়েই শিশুর সঙ্গে তার মায়ের নিবিড় সম্পর্কের উপযোগিতার কথা বলেন। এস্থলে শিশুর পিতার প্রতি বৈরীভাব দেখা দিতে পারে একথা তাঁদের অভিব্যক্তির ভিতর মেলে। তবে শুধু বৈরীভাব নয়, শিশুর সঙ্গে পিতার হৃদ্যতামুলক সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরণের অভিমতও তাঁরা পোষণ করেন। লরেন্সের মতে অল্পবয়সে কোন মানুষের সঙ্গে তার পিতার অপ্রীতিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হলে তার প্রভাব জীবনে হাণিকর হতে পারে। তিনি বলেন এর ফলে ব্যক্তি পিতৃজ্যোতি (**'Father Spark'**) লাভে বঞ্চিত হয়। পিতৃজ্যোতি বলতে তিনি বোঝেন পিতার চারিত্রিক ঐশ্বর্যলাভ। তিনি কোন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখে জানান যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাঁর মায়ের প্ররোচনায়। তিনি ও তাঁর ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় যখন স্কুল বা অন্য কোন স্থান থেকে ফিরতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মা তাঁদের বাবার বিরুদ্ধে নানা কটূক্তি করতে থাকেন। এ থেকেই তাঁদের মনে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব.দেখা দেয়। বস্তুতঃ তাঁদের বাবা হয়ত খারাপ মানুষ ছিলেন না ও তাঁদের মা-ই বোধকরি অত্যন্ত অধৈর্যপ্রকৃতির ছিলেন। মনে হয় লরেন্স যাকে পিতৃজ্যোতি বলে আখ্যা দেন সেটা ফ্রয়েড-প্রবর্তিত অধিশাস্তা (Super ego) সামিল। ফ্রয়েড বলেন মানুষ অধিশাস্তার প্রভাবে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে পারে।

ঈশ্বর ও ধর্ম দুই চিন্তাবিদের অভিমত ভিন্ন প্রকৃতির। ফ্রয়েড-তত্ত্বে ঈশ্বরের স্থান নাই। মামুলি ভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করা হয় সেটা মায়া (Illusion) ভিন্ন আর কিছু নয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকে ফ্রয়েড শিশুর শক্তিমান পিতার নিকট আবেদনের সমর্থক রূপে বিচার করেন। বস্তুতঃ ধর্ম বলতে বুঝায় কর্তব্যের প্রেরণায় কর্ম করা। মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বলব, সংবিৎ (Consciousness) ও যুক্তিনির্ভর জীবনদর্শনের প্রয়োগকেই প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য করা চলে। ফ্রয়েড বলেন এ ধরণের মানসিক বিকাশের পথে প্রধান বাধা স্বরূপ দাঁড়ায় শিশুসুলভ ও অযৌক্তিক মানসিকতার প্রভাব। লরেন্সের রচনায় ঈশ্বর ও ধর্ম-প্রসঙ্গের উল্লেখ মেলে। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর এক মহাশক্তির প্রকাশ। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, মানুষ প্রভৃতির

ভিতর ঐ শক্তির আংশিকরূপ বিকাশমান হয়। তবে ঈশ্বর অজ্ঞেয় ('Unknowable') লরেন্স বলেন আমরা মামুলীভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করি সেটা একটা ভাব বা ধারণামাত্র ('idea') ও এর ভিতর নৈতিকতাকে ('morality') খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু এ স্থলে বলা চলে এ ধরণের আদর্শকে অনুসরণ করলে মনের স্বভাবসম্মত মানসিকতার প্রকাশ ব্যহত হতে পারে। তিনি বলেন এ পথের অনুসরণ সমীচীন নয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে,—বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ের সহায়তা লাভ করে। এই ভাবে চললেই জীবনের পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলা সম্ভব হতে পারে। এই পথে চললেই মানুষ তার শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে ও প্রাণস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলতে পারে। বাস্তব জীবনে এ ধরণের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর অকৃত্রিম প্রেমানুভূতিরও প্রয়োজন আছে। এ জীবনবোধ ও জীবনানুভূতির স্পর্শ মানুষকে এক আনন্দময় সত্তায় উপনীত করতে পারে ও স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে। লরেন্সের মতে এই পথই ধর্মের পথ ও এই পথই তার আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

ফ্রয়েড যাকে মৃত্যুপ্রবৃত্তি (Death Instinct or Thanatos) বলে অভিহিত করেন, লরেন্সের চিন্তাদর্শনের ভিতরেও অনুরূপ শক্তির উল্লেখ মেলে। মৃত্যুপ্রবৃত্তি ধ্বংসাত্মক ইচ্ছার নামান্তর। এস্থলে ধ্বংস বলতে শুধু অপর ব্যক্তির ধ্বংসসাধন বুঝায় না, প্রতিকূল বা দুর্নীতিমূলক পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মনের ভিতর যে হিংসাত্মক মনোভাব সমাজবিরোধী বা অপরাধ-বোধ বিদ্যমান তার রূপান্তর বা উন্নয়নও বুঝায়। লরেন্স লিখেছেন, 'Anything that triumphs, perishes' (Reflections on the Death of a Porcupine)। এ ছাড়া তার একটি পত্রে মেলে : 'There is a Prince of Darkness. Some times I wish I could let go and be really wicked—kill and murder—but kill chiefly. I do want to kill. But I want to select whom I shall kill......It is this black desire that I have become conscious of.' (Letters) তবে মনে হয় লরেন্সও ফ্রয়েডের ন্যায় বিশ্বাস করেন, হিংসাবৃত্তির উন্নয়ন সম্ভব। তার কারণ তিনি ধ্বংসাত্মক শক্তির অতিক্রমণের ('Transcendence') উল্লেখ করেন।

এবার লরেন্সের বিভিন্ন উপন্যাসে যৌনশক্তির বিকাশের যে রূপ পাওয়া যায় তার বিবরণ দেওয়া যাক। তাঁর 'দি ট্রেসপাসার' (The Tresspasser)—এ প্রকাশমান ঈডিপাস মানসকূটের রূপ, 'দি অ্যারন্‌স্ রড' (The Aaron's Rod)--এ চিত্রিত

হয় প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট স্বামীর আত্মসমর্পণের রূপ, 'দি ভার্জিন এণ্ড দি জিপসী' (The Virgin and the Gipsy)—তে ব্যক্তির অগোচরে তার মনের গভীরে কি ধরণের মানসিকতা বিরাজ করতে পারে তার রূপ বিকাশমান হয়। 'দি প্লিউমড্ সার-পেণ্ট' (The Plumed Serpent)—এ যে জীবনচিত্র মেলে তা থেকে জানা যায়, প্রেম যদি অকৃত্রিমরূপে আত্মবিকাশ না করে তার ফল শুভ হয় না ও 'সেণ্ট মর' (St. Mawr)—এ পাওয়া যায় নারী যদি পুরুষের প্রেমলাভে বিফলমনোরথ হয় তাহলে সে অন্যভাবে বিকৃত ধরণের যৌনাসক্তিতে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

তবে লরেন্সের চিন্তাধারার ভিতর একটি বিরাট কূটভোগের (Paradox) পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'উইমেন্ ইন্ লাভ' (Women in Love) নামক উপন্যাসে। রুপার্ট ও উরশুলা পরস্পরকে ভালবাসে। উরশুলা রুপার্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। রুপার্ট-এর প্রেম গভীর বটে, তবে সে বলে তার মনের খানিকটা সে তার এক পুরুষবন্ধুর উদ্দেশ্যে অর্পণ করে। একথা শুনে উরসুলা হতবাক্ ও শঙ্কাগ্রস্ত। এ কেমন কথা? —প্রেমকে কি দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব? রুপার্ট তার প্রেমিকাকে বুঝাতে চেষ্টা করে, হৃদয়কে অকৃত্রিম-রূপে উভয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ বস্তুতঃ সম্ভবপর। প্রেমিক-প্রেমিকার ভিতর এই নিয়ে বহু তর্কাতর্কি হয় ও খানিকটা ভুল বুঝাবুঝিও দেখা দেয়। পরে তাদের মিলন ঘটে ও তারা বিবাহ করে।

কিন্তু প্রশ্ন, লরেন্সের লেখনী থেকে এ ধরণের কল্পনা দেখা দিল কেন? বাস্তবে কি এটা সম্ভব? একজন পুরুষ কি একটি নারী ও একজন পুরুষের প্রতি এক সঙ্গে ও সমভাবে কিংবা অনেকটা একই ধরণের ভালবাসা অর্পণ করতে পারে? কোন সমলোচক বলেন লরেন্সের মতে প্রেম শুধু যৌনাসক্তিকে কেন্দ্র করে বিকাশ-লাভ করে না,—এর সম্প্রসারিত রূপ মানব-প্রেম রূপে দেখা দেয়। এস্থলেও তদ্রূপ ঘটেছে।

তবু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যদি সত্যিকার ও যৌনাসক্তি-মূলক প্রেম দেখা দেয় তাহলে সেটা কি সর্বপ্রাপ্তিকরূপ নিয়ে বিকাশলাভ করে না? স্বভাবী প্রকৃতির প্রেম কি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে? কিন্তু যে স্থলে এরূপ ঘটে, সেখানে বুঝতে হবে ব্যক্তির অবচেতন প্রদেশে যৌনাসক্তিমুলক অতৃপ্তির বীজ নিহিত রয়েছে। মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন এ ধরণের অতৃপ্তির মুলে সকল স্থানেই বিদ্যমান ঈডিপাস মানসকুটের দুর্বার প্রভাবের রূপ। মনে হয় এস্থলেও ঐ ধরণের মানসিকতার সক্রিয়তা অংশগ্রহণ করে।

আমরা মনে করি লরেন্সের অভিজ্ঞতালব্ধ ঈডিপাস মানসকূটই এ ধরণের কল্পনের জন্মদাতা। বস্তুতঃ এই ভাবেই লেখকের মনের গভীরে বিদ্যমান কোন সংবদ্ধতার (Fixation) রূপ সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তবে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি মূলতঃ যৌনাসক্তির নগ্নপ্রকৃতির বিকাশের প্রভাবে ঘটেনা, এর অভিব্যক্তি প্রকাশমান হয় অপূর্ণ ও অবচেতন যৌনেচ্ছার উন্নয়নের (Sublimation) ফলে। সুতরাং বলা চলে উক্ত কূটাভাসের মূলে লরেন্সের ঈডিপাস মানসকূটের প্রভাব বিদ্যমান।

এখানে উল্লেখ করব, বিশিষ্ট ধরণের শিল্প ও বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃষ্ট রচনাগুলির ভিতর রচয়িতার অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার রূপ নানাভাবে দেখা দেয়। কোথাও সেগুলি বিকাশ লাভ করে উন্নয়নের রূপ নিয়ে, কোথাও রূপান্তরিত (Transformation) হয়ে আর কোথাও কোন প্রতীককে কেন্দ্র করে। তবে আমার বিশ্বাস সকল স্থলেই লেখক বা শিল্পীর অতৃপ্ত ইচ্ছার রূপ দুর্গেয় গোপনতা রক্ষা করে মনের গভীরে বিরাজ করে ও বিশেষ ধরণের শক্তির প্রয়োগে ঐ অতৃপ্ত ইচ্ছা সৃষ্টিমূলক সক্রিয়তার মাধ্যমে এক কামনার অলকাধাম গড়ে তোলে। প্রকৃষ্ট শিল্প বা সাহিত্য ঐ অলকাধামেরই স্বরূপ।

একটি নব প্রক্ষোভবাদ সম্বন্ধে অভিভাবন (২য়)

(ইং ১৯৩২ সনে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা বিভাগের সভাপতি ডঃ সুহৃদ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাষণ, —Suggestions for a New Theory of Emotion-এর বাংলা অনুবাদ।)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১)

ও

গৌরী চট্টোপাধ্যায় (২)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুভূতির মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ক্র্যুগার (Krueger) উপস্থাপিত তত্ত্ব একটি যথেষ্ট রীতিবদ্ধ মতবাদ। মনোবিদ্যায় "প্রক্ষোভের বিভিন্ন সমস্যা, গুরুত্ব এবং মৌলিকত্ব, উৎস আর সর্ব্বব্যাপী শক্তির প্রকাশ" সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর এই সংশ্লেষক সামাগ্রক মতবাদ (synthetical total conception) যখন ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ষ্টুম্ফ্ (Stumpf) পর্যন্ত একে অবোধ্য ব'লে আখ্যাত ক'রেছিলেন। অবশ্য আজকের দিনে এটিকে আর তত অবোধ্য ব'লে মনে হয় না কারণ এর একটা দিক, গেষ্টাল্ট্ (Gestalt) দিকটি—সাধারণকে এর প্রতি মনোযোগী হ'তে বাধ্য ক'রেছে। প্রত্যেক জিনিষ, এমনকি যেগুলিকে তুলনামূলক বিচারে আমরা আলাদা করতে পারি, "সেগুলিও একে অন্যের সঙ্গে অথবা অন্যকে কেন্দ্র ক'রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থেকে একটা সামগ্রিক পূর্ণতার সৃষ্টি করে, আর তার ফলেই তাকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। অনুভূতি এই সামগ্রিক পূর্ণতার গুণগত অভিজ্ঞতা।" এই গুণগুলি প্রিয়তা (pleasantness), অপ্রিয়তা (unpleasantness), পীড়ন (tension), শ্লথন (relaxation) এবং বহু ধরণের রঞ্জনা (tintings), ঘণত্ব (shadings), বা আকারের প্রকরণ (forms of flights) হ'তে পারে। এগুলিকে কোন সংখ্যার দ্বারা সীমিত করা যায় না, আর ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে সে ভাবনা বাদ দিয়ে দেখা যায়, একে সম্পূর্ণরূপে বর্গীকরণও (classified) করা যায় না। অনুভূতি সম্বন্ধে এ'ধরণের বর্ণনা

(১) মনোমিতিবিদ (উপাধ্যায়), ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) উপাধ্যায়া, জওহরী বিড়লা সমাজ-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

প্রক্ষোভায়িত এবং অপ্রক্ষোভায়িত এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য দুর করতে পারে কিনা, সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "বাস্তবিকই বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি (যেমন বস্তু বিনা উত্তেজনা, উত্তেজনার চণ্ডমূলভ প্রকাশ অথবা মেজাজ দেখানো) একটি যৌগিক ভাবের প্রকাশ। মূলতঃ স্বল্প-সংগঠিত আংশিক গূঢ়ৈষা (part-complex), যেমন,—যে কারণে আমি উত্তেজিত হ'য়েছি তারই চেতনার প্রতি, যা' আশা করি তারই দিকে, যা' খুঁজি সেটাই বা যে বিষয়ে ভীত তারই প্রতি আমাদের উত্তেজনার হেতু নিবদ্ধ হয়। অপরদিকে প্রপঞ্চবাদ বিষয়ক সাদৃশ্যতা ও রূপান্তরকরণের (phenomenological similarities and transformation) বর্ণনার জন্য এটাও সত্য যে এক ধরণের ঘটনা-বিন্যাস গুণগতভাবে অপর ধরণের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।" এরপর তিনি জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী এবং গবেষণাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ফলাফল তথা সিদ্ধান্তগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। সেই অনুসারে অনুভূতি সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যগুলি হোল—সার্বজনীনতা (universality), গুণগত প্রাচুর্য্য (qualitative richness), ভেদ্যতা (variability) এবং প্রবণতা (liability)। তাঁর প্রস্তাব ছিল এইসব নূতন বিভিন্নমুখী তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা ও পদ্ধতিগুলিকে রীতিবদ্ধ ক'রতে হোলে মানসিক সামগ্রিকতার একটা ধারণা থাকা চাই। এখানে মানসিক সামগ্রিকতা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হোল, "প্রথমতঃ, প্রক্ষোভের আভ্যন্তরীক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা (des erlebens); দ্বিতীয়তঃ, সার্বজনীন কার্মিক সংহতির সামগ্রিকতা (universal coherence of function); তৃতীয়তঃ এদের গাঠনিক সংস্থাপনার সামগ্রিকতা (totality of structural foundation) এবং শেষে, মানসিক এবং মানস-ভৌতিক (psycho-physical) গঠনের সামগ্রিকতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা আকার সৃষ্টির চেষ্টা সব সময়েই দেখা যায়, আর এই চেষ্টা অনুভূতির দ্বারা সংবদ্ধ। প্রত্যেকেই পরিগমের (environment) নিয়মগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বহু জন্মগত প্রক্রিয়ার অধিকারী। এইগুলি তার মানস-ভৌতিক অবয়বের আংশিক কাঠামো। এগুলি নমনীয়, সামগ্রিক বিচারে অবয়বীয়; সামগ্রিক অবয়বীয় গঠনের পরিবর্তন, পূর্বাবস্থাকরণ ও যুক্তিকরণ আর বৃহত্তর সামাজিক ও ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা এগুলি পরিবর্তিত হয়। শারীরিক ও মানসিক রুগ্নাবস্থায়, সংকটকালে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈপ্লবিক অবস্থায় এগুলি হয় ক্ষতিগ্রস্ত, না হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত।" মনস্তাত্ত্বিকদের উপরোক্ত অনির্দিষ্ট ধরণের স্বভাব পর্যবেক্ষন ক'রে, আকৃতি-প্রপঞ্চের (shape phenomena) কথা ব'লে বা কৃত্রিমজ অবয়ববাদী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে (structural reactions) জ্ঞানলাভ করে সন্তুষ্ট হ'য়ে বসে থাকা উচিত নয়,—সামগ্রিকতার বিচারে এই নিগূঢ় নোদনা সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যান এবং গবেষণা করা উচিত। এই কাজে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের (broadening

of outlook) প্রয়োজন, আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ফলের সমপর্যায়িক বিচারের মাধ্যমে একটি পূর্ণ রীতিবদ্ধ মতবাদ গড়ে তোলার প্রয়াস ক'রে যেতে হবে।

আপাততঃ আমি এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখে কাইসাউ (Kiesow) বর্ণিত সংবেদনের অনুভূতি-স্বন (feeling tone) তত্ত্বের প্রসঙ্গে আসছি। তিনি ষ্টাম্ফের (Stumpf) অনুভূতি-সংবেদন (feeling-sensations) তত্ত্বকে এবং জাইহেনের (Ziehen) অনুভূতির ঐন্দ্রিয়িক (sensualistic) ব্যাখ্যাকে অস্বীকার ক'রেছেন। ভ্যুণ্ড (Wundt)-এর সঙ্গে একমত হ'য়ে তিনি বলেছেন যে অনুভূতি মনের একটি মৌল উপাদান এবং তা' সংবেদন থেকে পৃথক। ভ্যুণ্ড-তত্ত্বের কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে টিচেনার (Titchener)-এর এবং ক্যুল্পে (Kulpe)-এর সমালোচনাগুলিকে মেনে নিলেও তিনি অনুভূতির মৌলিক গুণগুলির সংখ্যার প্রশ্নে ওঁদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি নিঃসন্দেহে বলেছিলেন—"প্রাচীন প্রিয়তা-অপ্রিয়তা তত্ত্বের এতখানি বিস্তৃতি নেই যাতে ক'রে এটি অনুভূতির বহু ভাব-অভিজ্ঞতার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখাতে পারে। আমাদের সম্পূর্ণ মানসজীবনকে বুঝতে হোলে অনুভূতির যে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে সেই প্রশ্নটি একমাত্র কোন বহুমাত্রিক তন্ত্র (multidimensional system) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।" শিশুদের ওপর গবেষণাগারিক পরীক্ষা এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের অবেক্ষণ ক'রে তিনি বুঝেছিলেন যে সংবেদন ও অনুভূতি একসঙ্গে সুরু থেকেই দেখা যায়, আর প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে সৃষ্টি হয় না।

ওয়াসবার্ণ (Washburn) দেখতে চেয়েছিলেন কখন প্রক্ষোভ চিন্তার গতিকে ব্যাহত করে আর কখন একে সাহায্য করে। তাঁর চিন্তার ক্রিয়াঙ্গ তত্ত্বে (motor theory) এই সমস্যা সমাধানের সুন্দর বর্ণনা আছে। পিলসবেরী (Pillsbury) প্রক্ষোভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে জোর দিয়ে ব'লেছেন—"সমস্ত শিক্ষা-ক্রিয়া (learning) আর যেগুলিকে আমরা সহজ প্রবৃত্তি বলি, একমাত্র তাদের ক্রমিক প্রতিবর্ত (chain reflex) অংশগুলি ছাড়া, বাকিটা আধান বা প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে প্রক্ষোভ এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও অজ্ঞ।"

সুচারুভাবে লিখিত প্রবন্ধে ক্লেপারেদি (Claparede) অনুভূতি ও প্রক্ষোভের পার্থক্যকে কায়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে বলেছেন প্রথমটি আমাদের মানসিকতার উপযোগী এবং শেষোক্তটি কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না। জেমস্-ল্যাঙ্গ

(James-Lange)-তত্ত্বটি এই প্রসঙ্গে একটু অসুবিধা সৃষ্টি ক'রেছে।" যদি প্রক্ষোভ কেবলমাত্র জীবের প্রান্তিক-পরিবর্তনের (peripheral change) চেতনাই হয় তবে কেন তাকে অঙ্গীয় সংবেদন (organic sensation) ব'লে না ধ'রে প্রক্ষোভ ব'লেই প্রত্যক্ষ হয়?" ক্লেপারেদির মতে, "প্রক্ষোভ, এই বিভিন্ন অঙ্গীয়-সংবেদনাদির গুণগত আকৃতির ধারণা,—একটি গেষ্টাল্ট্ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরার্থে প্রক্ষোভ হোল জীবের পরিবৃত্তিক প্রতিন্যাসের (global attitude) একটি চেতনা।" "বলতে গেলে বলতে হয় প্রক্ষোভের চেতনা জীবের আকারেরই চেতনা—তার শরীর-সম্বন্ধীয় প্রতিন্যাস।" প্রক্ষোভের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং অভিযোজনা ও প্রতিযোজনার মিশ্রণের আনুপাতিক হার অনুযায়ী তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ডানল্যাপ (Dunlap)-এর মতে একমাত্র আন্তরযন্ত্রীয় (visceral) পরিবতনের মাধ্যমেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বোঝানো সম্ভব। এইগুলিকেই প্রক্ষোভের বাস্তব সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়—প্রক্ষোভটিকে নয়। আন্তর-যন্ত্রীয় পরিবর্তনগুলি সাধারণ পটভূমিকায় কাজ ক'রে যায়, যার ফলে অন্যান্য বাহ্যিক পরিবর্তনগুলির উপস্থিতি বোঝা যায়। এই আন্তরযন্ত্রীয় পটভূমিকা গতীয় (dynamic) পর্যায়ের—অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া-চালনা ও আধারিত করার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যা' শেষ পর্যন্ত পেশী-সক্রিয়তার (muscular activity) কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রিন্স্ (Prince)-এর মতে প্রক্ষোভ-সম্বন্ধীয় বহু রহস্যেরই মীমাংসা হবে যদি একে শক্তি (energy) হিসাবে কল্পনা করা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন ব্যক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কাজ সম্পন্ন করতে যে ধরণের শক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, নিত্যকার কাজে সে পরিচয় রাখা অসম্ভব। মনে হয় এসময়ে তাঁরা যেন কোন সঞ্চিত শক্তির আধারে হাত ডুবিয়েছেন। আমার ধারণা তাঁরা এমন একটি উল্লাস (exaltation) স্তরে ওঠেন বা ভাবোল্লাসে (ecstasy) আপ্লুত হন কিংবা প্রক্ষোভজনিত সর্বকিছু বাধা হ'তে মুক্ত হন বা সেগুলিকে ত্যাগ করেন, যার ফলে সেই সঞ্চিত শক্তির আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে গিয়ে প্রক্ষোভের সব গতীয় শক্তির পূর্ণ কাম্মিকরূপ, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ওঠে। অ্যালবার্ট ভাইস্ (Albert Weiss) বলেছেন যতদিন না মানসিক-ক্রিয়া পর্যালোচনায় আপাতঃ কারণনিচয়কে (causal implications) ত্যাগ করা যাবে আর উদ্দীপন-প্রতিবেদন (stimulus-response) সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত হবে, ততদিন প্রক্ষোভ মনোবিজ্ঞানের একটা বিশেষ বিষয় বলে প্রতিভাত হবে না।। তাঁর মতে—"বৈজ্ঞানিক বিচারে, তুলনামূলক অন্যান্য মানসিকতার আপেক্ষিকতায় প্রক্ষোভ একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ, জৈব-সামাজিক (bio-social) উপযোজনায় এর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। প্রক্ষোভের প্রশ্নটি তখনই আসে যখন

জৈব-সামাজিক কোন নির্দিষ্ট কাজের নিয়তি-নির্দ্ধারক রূপে কোন অনির্দিষ্ট বাধা সৃষ্টি হয় বা কোন আঙ্গিক পরিচালনায় অন্তর্শক্তি এবং জৈব-সামাজিক উপযোজনায় নিয়তি-নির্দ্ধারকরূপে প্রকট হয়।

পূর্বোল্লিখিত 'অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মনস্তত্ত্ব' নামক পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখতে পাই ব্যুহ্‌লার (Buhler) বলেছেন শিশুদের ক্রীড়াকে ব্যাখ্যা করার জন্যে সুখসূত্রের পরে আর কিছু চিন্তা করার আবশ্যকতা নেই। কতকগুলি গতির প্রকাশই সুখের পরিচয়। তিনি এ'গুলির নামকরণ করেছেন 'বৃত্তি-সুখ' (Function Pleasure)। ম্যাক্ ডুগাল (Mc Dougall) কার্ম্মিক সমগামীত্ব (functional relations)-এর সঙ্গে ঐচ্ছিক কর্মের বৃত্তিয় সম্পর্কের বিচারে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের গুণগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের ব্যর্থতা ও সাফল্য থেকে এবং এগুলির সাপেক্ষে অনুভূতির উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রক্ষোভ সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না বরং এসব কিছুর পূর্বে অভিজ্ঞাত হয়। সীশোর (Seashore) প্রক্ষোভের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বন-চিত্র-লিখন (phonophotography) নামক একটি নূতন দিক, একটি নূতন পদ্ধতির উল্লেখ ক'রেছেন। ষ্ট্যাট্রন্ (Stratton) উত্তেজনাকে অভিন্ন প্রক্ষোভ হিসাবে চিহ্নিত করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন এবং ব'লেছেন যে, বাহ্যিক পরিস্থিতিতে আমাদের বিভিন্ন আকাঙ্খাগুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। কার্ (Carr)-এর মতে প্রক্ষোভের অবস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম সংবদ্ধ ঘটনা-চক্রের মাঝে অসংলগ্ন ব্যবহারের মধ্যে, অন্যদিকে প্রক্ষোভহীন উপযোজনা অনেক সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ। হয়েসীংটন (Hoisington) ব'লেছেন "আনুভূতিক অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ এক ধরণের প্রেষ-বেদনের (pressure sensation) ন্যায়।" এই প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার স্থান-নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। গ্যল্ট (Gault) মূক-বধিরদের উপর স্পর্শ-উদ্দীপকের প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পরীক্ষার ফল আমাদের পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

উপরোল্লিখিত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের শারীরবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আছে এই বিষয়ের উপর লিখিত তিনজন বিখ্যাত মনীষী—ক্যান্নন্ (Cannon), বেক্‌তেরেভ (Beckterev) ও পীরেঁা (Pieron)র তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ। ক্যান্নন্-এর মতে বর্ত্তমান শারীরবৃত্তির তথ্যের ধারণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের থ্যালামাস বিভাগ হ'তে জাত অসাধারণ শক্তিশালী কোন প্রভাব মস্তিষ্কের নিউরন-নিচয়কে উদ্দীপিত

করে, ফলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বেকৃতেরেভ দেখিয়েছেন—"যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অনুভূতি ও প্রক্ষোভ নামে পরিচিত সেগুলি রক্তের গাঠনিক পরিবর্তনের জন্যই সৃষ্ট হয়। তাই এই মানসিকতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে জানতে হবে সেই সমস্ত শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়াগুলিকে, যার মাধ্যমে রক্তের দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন আসে। এই যন্ত্রগুলির কয়েকটি হোল অন্তর্গ্রন্থিরস-ক্ষারক (internal secretion)।" তিনি আরও দেখিয়েছেন—"কোন ব্যক্তির কোন মানসিক প্রকাশ হোল অনুরূপ উদ্দীপনের সাপেক্ষ প্রতিবর্তক। এই ধরণের প্রতিবর্তকগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরূপিত হয় কারণ প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কর্মের পূর্বানুমান (pre-suppose)। ওয়াট্‌সন (Watson) বিবৃত ত্রয়ী প্রক্ষোভ-প্রতিবর্তের (three emotional-reflexes) সঙ্গে আরও দুটি প্রতিবর্ত—জৈবিক সুখ ও জৈবিক অসুখ, যোগ করা উচিত। পরিশেষে তিনি দেখালেন যে তিনি এমন একটি প্রতিবর্ত-চিকিৎসা-পদ্ধতির (Reflex Therapy) উদ্ভাবন করেছেন যা একদিকে সাধারণ উদ্বায়ুর প্রাথমিক রোগচিহ্নগুলির ক্ষেত্রে, অন্যদিকে জটিল বিরক্তিকর অবস্থাগুলির ক্ষেত্রেও সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে। পীরেঁা বললেন প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় নার্ভীয় শক্তির অস্বভাবী-মোক্ষণের (abnormal discharge) জন্য। একে অস্বভাবী-মোক্ষণ বলা হয় কারণ, মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াদির জন্য যতটুকু মোক্ষণের প্রয়োজন এর পরিমাণ তার অপেক্ষা অনেক বেশী ; এবং অনেক সময়ে যখন সত্যই কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণ থাকে না তখনও এধরণের মোক্ষণ দেখা যায়। ফলস্বরূপ শারীরিক আন্তরযন্ত্রগুলির মধ্যে উত্তেজিত আবেগ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে,—যা' কেবল যে সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয় তা'ই নয়, ক্ষতিকারক এবং রোগজনিকও বটে। এর সঙ্গে আবার নার্ভীয় ক্ষয়ের ওপর এদের কুপ্রভাবগুলি যুক্ত হয়, ফলে শক্তি-মোক্ষণ অত্যধিক হ'তে থাকে। একমাত্র সেই সমস্ত উচ্চ জৈবিক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বা দ্যোতনা দেখা যায় যাদের আনুষঙ্গিক স্নায়ুনিচয় (associative nervous system) সুসংবদ্ধভাবে কাজ করে।

চতুর্থখণ্ডে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের রোগবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। পীয়ের জ্যানে (Pierre Janet) এখানে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত (melancholia) ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কর্মের প্রতি ভীতি একটা মুখ্য মৌল উপাদান। কোন কিছু করার মাঝে বাধা সৃষ্টি করাটাই কর্মভীতির প্রথম পর্ব। কোন কিছু করাকে বাধা দানের একটি প্রকৃতি হোল কেবল কাজটাই নয়, এর আরম্ভ করাটাই মনের মধ্যে না আনা। "কামনা (desire) আর কিছুই নয় কেবল কাজ সুরু করার ভাব আর এর সঙ্গে চেষ্টা (effort) জড়িত থাকে ব'লে মোটামুটি এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই এই রোগের রোগীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই কামনাকে বাধা দেয়, এমন কি এদের যথাসাধ্য

নিরুদ্ধ (supress) করে। এ ধরণের রোগীরা কেবল যে খাদ্য গ্রহণে গররাজি তা নয়, তারা দাবী করে তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনই নেই কারণ তারা ক্ষুধার্ত নয়, এমনকি তাদের খাবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই।" কামনাকে নিরুদ্ধ করার এই প্রচেষ্টা তাদের মনে জাগে কারণ তখন তারা কোনরকম সন্তুষ্টি বা সান্ত্বনার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না —ভবিষ্যৎ তাদের কাছে এক অন্ধকার গহ্বর বলে মনে হয়। কাজ করা থেকে এই পলায়ন-মনোবৃত্তির প্রসঙ্গে জ্যানে, "কর্ম ও অনুভূতির বিপর্যয়" (inversion of acts and feelings) নামে একটি বিস্ময়কর তথ্যের বর্ণনা ক'রেছেন। একটি কাজ করতে গিয়ে এই ধরণের রোগীরা সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি ক'রে বসল। এই ধরণের অসংগত ব্যবহারের ব্যাখ্যাদানে জ্যানে 'ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণ' (regulation of action) সূত্র নামে কতকগুলি সূত্রের অবতারণা করবার চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "কর্মই হোল মনস্তাত্ত্বিক বিচারে আসল বাস্তবতা এবং নৈতিক জীবনের মূলকথা —এগুলি সম্পাদন করার জন্য আমাদের প্রভূত শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন। এইসব বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত রোগীরা তাদের দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মভীতির বলি হ'য়ে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক-দুর্বলচিত্ততার প্রতিভূ ব'লে চিহ্নিত হন। কর্মভীতি যখন তাঁদের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে না তখন কাজটি করার পরিমাণ অল্পই হয়; তাঁরা মন্থর গতিতে কাজ করতে পারেন তবে তা নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও আমরা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে সব রকম শারীরবৃত্তিয় অপারগতার লক্ষণসমূহ দেখতে পাই যেগুলো কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের (central nervous system) মধ্যে অবক্ষয়ের ফলেই সম্ভব হয়।" তাঁর মতে, রোগীদের ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি গুরুতররূপে প্রকট হয়, সেইগুলিই সাধারণের ক্ষেত্রে লঘুভাবে দেখা যায়।

কার্ল য়োর্গেন্‌সেন্ (Carl Jorgensen)-এর অভিভাবনে ভয়, সুখ, দুঃখ, বাসনা, ক্রোধ, লজ্জা আমাদের প্রক্ষোভজীবনের মৌল উপাদানাদি। য়্যাড্‌লার (Adler)-এর প্রতিবেদনে অনুভূতি কোন স্বতন্ত্র দ্যোতনা নয়, তারা সক্রিয়ভাবে কোন কাজকেই পরিচালনা করে না। কিন্তু তা প্রত্যেক পরিপূর্ত-ক্রিয়ার (global action) ক্ষেত্রে যুক্ত থাকে। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একক উৎপাদক হোল তার মানসিক হীনমন্যতা (feeling of inferiority)। এই হীনমন্যতা এবং সামাজিক অনুভূতিগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। "যদি আমরা কোন অনুভূতিকে, কোন বিষয়ের দ্যোতনা ও জীবন-যাত্রা প্রণালী থেকে পৃথক ক'রে দেখি, তা'হলে কেবলমাত্র শারীরবৃত্তিক উৎপাদকগুলিই চোখে পড়বে। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য আমাদের জান্‌তে হবে অনুভূতিটির গতির লক্ষ্য কি।"

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

["চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের ধারা" শীর্ষক যন্ত্রস্থ পুস্তকের "মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন" অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার।]

সভ্যতার ইতিহাসে বহু যুগ হইতেই উন্মাদরোগ বা Madness শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। হোমারের কাব্যে উন্মাদ রোগের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইউলিসিস পাগলামীর ভান করিয়াছিল। আজাক্সের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। লেভিটিকামে এই রোগের যাহা বিধানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে বহু জীবন-হানির কারণ হইয়াছিল। "যাহার মস্তিষ্কে ভৌতিক বিকার হইবে অথবা যে মায়াবী—মৃত্যুই তাহার দণ্ড" অথবা "witch কে বাঁচিতে দিও না," এতাদৃশ বহু উল্লেখ যত্র-তত্র দৃশ্যমান। পুরাতন বাইবেলে মস্তিষ্ক-বিকৃতির খুব কম উল্লেখ আছে কিন্তু নূতন বাইবেলে বহু স্থানে মস্তিষ্ক-বিকৃতির উল্লেখ আছে। হিপোক্রিটিসের গ্রন্থমালায়ও ইহার উল্লেখ আছে, এবং অপ্রাকৃতিক কারণ হইতে ইহাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্ত্তীকালের গ্রীক লেখকেরা, বিশেষতঃ সোরেনাস্ (Soranus) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এই রোগের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা উপসর্গ অনুসারে ইহার শ্রেণীবিন্যাস করিয়া সহানুভূতি, বিবেচনা ও মানবিক অনুপ্রেরণা দ্বারা এই রোগের চিকিৎসার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অল্পকাল পরে পরবর্ত্তী শতাব্দীর সূচনার দিকে 'জাদুবিদ্যার' প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মীয় যাজকেরা উহাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের অভিযুক্ত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইল। এই যাদুকরদের দৈহিক লক্ষণ নির্ণয়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইল এবং অনুভূতিশূণ্য চর্ম ও ঝিল্লীস্তরের অবস্থানই উহার প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিল। আসলে ইহা হিষ্টিরিয়া রোগেরই একটি লক্ষণ

ইহাকে 'ভৌতিক চিহ্ন' ("Stigmata Diaboli") বলা হইত। ইহাদিগকে 'ডেভিল আশ্রিত' বলা হইত। বহু 'যাজক' ও 'সেন্টের' ডেভিল বিতাড়ণের বিষয়ে নানা চিত্র বিশ্বের চিত্রশালাগুলিতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

৪৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'যাদুকর'কে (witch) খৃষ্টান অনুশাসনে সরকারীভাবে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ইহার পর ইহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। জ্যাকব স্প্রেঞ্জার (Jacob Sprenger) এবং হেইনরিখ্ ক্র্যামার (Henrich Kraemer) নামক দুইজন ধর্মযাজক পোপের অনুমোদন লইয়া যাদুকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং নিজেদের 'ভগবানের শিকারী কুকুর' (Domini Canes) বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের কাজ ছিল ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে কুকুরের মত ডাক দিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া। ১৪৮৯ খৃঃতে তাঁহারা "ম্যালিয়াস্ ম্যালিফিকেরাম্" (Malleus Maleficarum) নামক একটি গ্রন্থ (অর্থাৎ যাদুকরী-বিরুদ্ধ হাতুড়ী) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় ভাগে যাদুকরদের লক্ষণের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছিল তাহা সত্যই 'উন্মাদ রোগের' লক্ষণ। সে সময় জনসাধারণের 'জ্ঞান বিকৃতি' এইরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে ঐ পুস্তকখানি ৩০০ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। এইরূপে যাহারাই যাদুকর বলিয়া চিহ্নিত হইত, উৎপীড়নে মৃত্যুই তাহাদের মোক্ষলাভের একমাত্র পথ ছিল। ইহাই সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উন্মাদ রোগের পরিণতি ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই অবশ্য উন্মাদ চিকিৎসালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কেবল 'পাগ্‌লা-গারদ' অর্থাৎ কারাগার ছিল। লণ্ডনের বেথেল্‌হেম হাসপাতাল (Bethelhem Hospital) নামক চিকিৎসালয়টি ১২৪৭ খৃঃতে স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৩৭৭ খৃঃ হইতে উহাতে বিকৃত-মস্তিষ্কদের আগমন আরম্ভ হয়। একটি ১৩৯৭ সালের বিবরণীতে উহার আসবাবপত্রের হিসাবে পাওয়া যায় যে উহার আসবাবপত্রের মধ্যে ৪টি মিনেক্‌লস্ (Menacles), ১১টি লৌহশৃঙ্খল, ৬ জোড়া তালা-চাবি ও ২ জোড়া ষ্টক্‌স্ (Stocks) ছিল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ঐ পাগলা-গারদে উন্মাদ-রোগীদের অমানুষিক পীড়ণের দৃশ্য লণ্ডনের আকর্ষণ ছিল।

পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের প্রথম আভাষ মনোবিজ্ঞানী জুয়ান লুই ভাইভ্‌সের [Juan Luis Vives (১৪৯২—১৫৪০ খৃঃ)] লেখা হইতে জানা যায়। কিন্তু কার্যতঃ ফলদায়িনী হইয়াছিল রাইণল্যাণ্ডের চিকিৎসক জোহান ভায়ার [Johann wyer (১৫১৫-৪৪ খৃঃ)] লিখিত পুস্তক ডি প্রেষ্টিজিস্ ডিমোনাম্ (De Praestigiis daemonum) —(অপদেবতা-অধিকৃতদের লক্ষণ) হইতে। ভায়ারই প্রথম মনোবিজ্ঞানী যিনি মানসিক

রোগীদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং মনোবিজ্ঞানকে খৃষ্টধর্মের অনুশাসন হইতে মুক্ত করেন। ঐ সময়েই ফেলিক্স প্লেটার [Felix plater (১৫৩৬-১৬১৪ খৃঃ)] বাসলোর শরীর-শাস্ত্রের অধ্যাপক (Anatomy) ছিলেন। পাগলা-গারদে যাইয়া পাগলদের মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনিই পাগলদের বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই শ্রেণীবিন্যাসে আধুনিকতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি মনোবিকারকে স্বাভাবিক কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই—উহা অপদেবতারই ক্রিয়াকলাপ বলিয়া স্থির করেন।

এইরূপ বহু অন্ধকার যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৭৯৩ খৃঃতে ফিলিপ পাইনেল [Philippe Pinel (১৭৪৫-১৮২৬)] নামক প্যারী শহরের একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের লেখক প্যারী নগরের উপান্তে বিয়েত্রে (Bieetre) নামক কুখ্যাত পাগলা-গারদের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইলেন। তিনি গারদখানার অমানুষিক অত্যাচারে আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিলেন। একজন প্রায় ৪০ বৎসর এবং অপর আর একজন প্রায় ৩৬ বৎসর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি তৎক্ষনাৎ উহাদের শৃঙ্খলমুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন। বহু কষ্টে পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন পাওয়া গেল। যাহা হউক এই মুক্তি বহু ক্ষেত্রে উন্মাদ-রোগীদের আরোগ্যের পথে পৌছাইয়া দিল। উন্মাদ-রোগের নুতন আলোকপাতের সুচনা হইল। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক হইতেই উন-বিংশ শতাব্দীর ফরাসী মনোবিজ্ঞানের নুতন ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডেও বিভিন্ন কারণে অনুরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল। উইলিয়ম টুকে [William Tuke—(১৭৩২-১৮২২)] ইয়র্ক শহরের কোয়েকস্ দলভুক্ত একজন বিশিষ্ট বনিক ছিলেন। কোয়েকস্ দলের নিয়ম ছিল সাধারণ জীবনযাত্রা ও উচ্চ-মার্গের চিন্তা। তিনি তাঁহার অবসর সময় পরোপকারে নিয়োগ করিতেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক শহরের পাগলা-গারদে একজন কোয়েকার অত্যাচারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টুকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া অতি মনঃকষ্টে সময় কাটাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক শহরের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আবেদন করিলেন। সকলেই অন্তরের সহিত সম্মতি জানাইলেন। অবশেষে সকলের সহযোগিতায় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ৩০টি রোগীর শয্যাসহ "রিট্রিট" (Retreat) নামক একটি উন্মাদ-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইল। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে, শৃঙ্খলমুক্ত, যতদুর সম্ভব বাধা-নিষেধ-মুক্ত আধুনিক যুগের সুচনাস্বরূপ প্রথম উন্মাদ-আশ্রম স্থাপিত হইল। উহাতে মনোচিকিৎসার জন্য দৈহিক নানাবিধ কাজে মনোনিবেশ ও নানারূপ শিল্পকর্মের কাজে

তাহাদের নিয়োগ করা হইল। মানবিক উচ্চ চিন্তাধারার এইরূপ অভাবনীয় শক্তি যে, যে সময়ে ফরাসীদেশে পাইনেল তাঁহার আরব্ধ সংস্কার কার্যসাধনের সঙ্কল্প করেন, ঠিক সেই সময়ই ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপভাবে টুকেকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। ফরাসী দেশে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ফলে পাইনেলের চিন্তাধারা ১৮০১ সালের পূর্বে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। টুকে ও প্যাইনেলের আন্তরিকতা সত্ত্বেও উন্মাদ আশ্রমের পরিচালনার সুবিধার জন্য বহু কর্মচারী বহু পাগলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিত এবং রক্ষীগণও অতি কঠোর ব্যবহার করিত। ১৮১৪ সালে কয়েকটি উন্মাদ রোগী ইয়র্কের উন্মাদ-আশ্রম হইতে পলায়ন করিলে জনসাধারণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট একটি বিশেষ কমিটি উন্মাদ-আশ্রমগুলির অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োগ করিলেন। উহাদের অনুসন্ধানের ফলে উন্মাদ-আশ্রমগুলির অতি শোচনীয় অবস্থার চিত্র প্রদর্শিত হইল। উন্মাদালয়ের সমস্ত পরিবেশ অতি কদর্য্য ও শৃঙ্খলাহীন ছিল। রক্ষীরা অজ্ঞ ও মমতা-হীন ছিল। শৃঙ্খল ও বন্ধন তখনও নির্বিচারে ব্যবহৃত হইত। একটি উন্মাদাগারে গলায় ও অঙ্গের নানাস্থানে লৌহ-আবেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া একজনকে একটি দণ্ডায়মান লৌহদণ্ডে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া ১২ বৎসর রাখা হইয়াছিল যে সে কেবলমাত্র শয্যাশ্রয় করিতে এবং দণ্ডায়মান হইতে পারিত। আর কোন অঙ্গ-চালনা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এইরূপ বহু অত্যাচারের চিহ্ন বর্ণনা করা হইয়াছিল। কয়েকজন শান্ত সৎকামী মানুষের চেষ্টায় ইহার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব ছিল। নূতন মতবাদ প্রচারের জন্য একজন উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন ছিল। জন কনোলী [John Conolly (1794-1866)] এইরূপ এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে চিকিৎকরূপে আগমন করেন। ১৮২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে উন্মাদ-রোগকে বিশেষ পাঠ্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিয়া ওয়ারউইকশায়ার শহরে সাধারণ চিকিৎসকরূপে কার্য আরম্ভ করিলেন। অচিরে তিনি ১৮৩৯ সালে মিড্‌লসেক্সের হ্যানওয়েল উন্মাদাগারে আবাসিক চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাই ইংলণ্ডের সর্ববৃহৎ উন্মাদাগার ছিল। ইহার পূর্বেই উইলিয়াম টুকে, তাঁহার পুত্র ও অন্য কয়েকজন দয়াশীল ব্যক্তির চেষ্টায় উন্মাদ-রোগীদের উপর অত্যাচার ও বন্ধনাবস্থা বহুলাংশে শিথিল হইয়াছিল। কনোলী হ্যানওয়েলে

যোগদান করিয়াই সকল প্রকার উন্মাদদের শারিরীক সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উদার ব্যবহার ও চিকিৎসার বিশেষ গুণে ৫ বৎসরের মধ্যে উন্মাদ-রোগীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অপ্রীতিকর কোন ঘটনাই উদ্ভূত হওয়া সম্ভব হইল না। তিনি তাঁহার কার্যপ্রণালী ও নূতন মতবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। সমগ্র ইউরোপে অনুরূপ সংস্কারের প্রবর্ত্তন সূচিত হইল।

এই অনাবদ্ধ আন্দোলন প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। আমেরিকায় টমাস কার্কব্রাইড(১৮০৯-৮৩) এবং বেঞ্জামিন রাস (১৭৪৫-১৮১৩) এই সংস্কারের সূচনা করিলেন। কোন কোন গারদ যদিও শৃঙ্খলমুক্ত হইল কিন্তু রোগীদের কামরার বাহিরে তালাবদ্ধ থাকিত, সাম্প্রতিক কালেই কেবল সকল প্রকার মস্তিষ্ক-বিকৃত রোগীদিগকে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করা হইযাছে। আধুনিক কালে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপণার গুণে ও ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান বিষয় ছিল রোগীকে সর্বক্ষণ দিনে ও রাত্রে নজরাধীন রাখিতে হইবে।

তাহার পর ফ্রান্সে জঁা ইতিয়েন ডমিনিক্ এস্‌কুইরল (Jean Etienne Dominique Esquirol—1772-1840) এবং গুইলামে ফেরাস্ (Guilamme Ferrus—1784-1861) উন্মাদ-রোগ বিষয়ে বহু গবেষণালব্ধ পুস্তক রচনা করেন। ফেরাস্ উন্মাদাগারের বহুল বিস্তার করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম উন্মাদ-রোগীদিগকে অপরাধীদের দল হইতে পৃথক করেন। তিনি বিয়েত্রেতে প্রথম কর্মনিয়োগ-পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনিই ৩০শে জুনের (১৮৩৮) আইনের প্রধান হোতা ছিলেন। ঐ আইনের সাহায্যে পাগলদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং পাগলা-গারদের উন্নতি ও প্রদেশে প্রদেশে নূতন-নূতন উন্মাদ-আশ্রম স্থাপন করা হইল। জার্মাণীতে এই পরিবর্তন আগে মন্থর ছিল। সকল উন্মাদাগারে জোহান ক্রিশ্চিয়ান রেইলের [Johann Christian Reil—1749-1813] প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। রেইল মানবিক হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি উন্মাদদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। তৎসহ মনস্তাত্ত্বিক কারণে "অনাঘাত উৎপীডন প্রথার" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উন্মাদদের জলে ডুবাইয়া রাখা হইত ; তাহাদের নিকট কামান ছোঁড়া হইত এবং সময়ে-সময়ে হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে নাটকীয় পরিস্থিতি উপস্থিত করা হইত—যাহাতে চিকিৎসক ও রক্ষকগণ বিচারক, দেবদূত প্রভৃতির ভূমিকা লইয়া রোগীর কল্পনায় দেখা দিতেন। কখনও বা কবর হইতে সদ্য-উত্থিত প্রেতাত্মার অভিনয় করিতেন। এই আদিম যুগের মানসিক আঘাত দেওয়ার পদ্ধতি বহুকাল প্রচলিত ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইহার পরিবর্তে প্রগতিশীল ওয়াইন্‌স্ এ্যাক্ট (Wynnes Act) প্রবর্ত্তন দ্বারা উন্মাদ রোগীরা সব সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীণে আসিল।

তাহার পর ১৮২৮ সালে পাগলা-গারদে প্রবেশ করিলে অনুমতি-পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। এবং ১৫ জন কমিশনার লইয়া অনুমতি-পত্র বিলির জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করা হইল। যাহাতে এই আইনের কোন অপব্যবহার না হয় তাহার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা লওয়া হইল। যাঁহারা এ ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন লর্ড স্যাফ্‌টসবেরী তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন ডোরোথিয়া লিণ্ডে ডিক্স [Dorothea Lynde Dix—1802-87]। ইনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শিক্ষয়িত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কারাগারে, উন্মাদ-আশ্রমে প্রভৃতির অব্যবস্থা ও মানবিক অধিকারচ্যুতির শোচণীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আন্দোলন সুরু করিলেন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া প্রায় ৩২টি নূতন পাগলদের আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অন্যগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিকট বিবরণ দিলেন যে তিনি স্বচক্ষে ৯০০০ উন্মাদ, মৃগী-রোগগ্রস্থ ও বুদ্ধিভ্রংশদের দেখিয়াছেন। উহাদের যত্ন করিবার কেহ নাই। উহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। উহাদের লৌহদণ্ড দ্বারা শাসন করা হয়। হৃদয়হীন ব্যবহার দ্বারা তাহারা দিন-রাত উৎপীড়িত হইতেছিল। মহিয়সী মহিলা লিণ্ডে ডিক্স অতঃপর স্কটল্যাণ্ডে আসিয়া সেখানকার পাগলা-গারদগুলির অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন এবং তাঁহারই বিপুল চেষ্টায় এবং আন্দোলনে অচিরে মস্তিষ্ক-বিকৃত রোগীদের আশ্রমের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি রাজকীয় সমিতি গঠিত হইল। সদস্যদের আমন্ত্রণে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও বক্তৃতা দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাগলা-গারদের আরো অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অনাবদ্ধ (non-restraint) অবস্থা কিছু কাল চলার পরই মানসিক-চিকিৎসালয়-সমূহে প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হইল। এই পৃথকীকরণের দ্বারা তাহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ব্যাধিকে কেবলমাত্র ব্যাধি ভাবিয়া চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের সাফল্য আসে নাই।

(ক্রমশঃ)

এক ঝলক

তরুণচন্দ্র সিংহ *

আমি আমার কথা লিখিতে বসি নাই, কলমচির কাজ করিতেছি মাত্র। তাহা কাহারও নির্দেশে বা অনুরোধে নয়, সেখানে আমার ইচ্ছার ক্রিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিব। তাহার বেশী কিছু নহে। কেন আমার অপরের কথা লিখিতে ইচ্ছা হইল সে কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন হইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো কারণ আরোপ করিবেন—তাহাতে তাঁহাদের মন্তব্য সিদ্ধ হইবে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজ বিশেষ ছিল না। রবীন্দ্র সরোবরের পারে চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া একটু জনবিরল ঠাঁই দেখিয়া ঘাসের উপর বসিলাম। আপন মনে সময় কাটাইতে নিরালায় বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই, তারাগুলি তাই যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। বেশ লাগিতেছিল। এই শহরে আরামে নির্জনতা উপভোগ করার ভাগ্য বোধ হয় কাহারও নাই। একটু পরেই দুইজন যুবক আসিয়া কাছেই বসিয়া নিজেদের কথা বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজনই মূল বক্তা, অপরজন শ্রোতা। মাঝে মধ্যে দুই একটা কথা সে বলিয়াছিল মনে হয়। বক্তা যত কথা বলিয়াছিল সব মনে নাই। তবু মোটামুটি তাহার কথা যথাসম্ভব তাহার ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। ঠিক ঠিক লেখা সম্ভব হইবে না তাহা আমি জানি। অত কথা কি মনে থাকে! তবু যতটা পারি লিখিতে চেষ্টা করি।

হঠাৎ কানে আসিল বক্তা বলিতেছে "এই মাঠে বাদাড়ে অন্ধকার তবু সহ্য হয়, কিন্তু বাড়িতে বসেও যদি অন্ধকারে গুম হয়ে থাকতে হয় তবে কি তা সহ্য হয়! যখন তখন বাতি নিভে যাচ্ছে। কখনো তিন চার ঘণ্টা এক নাগাড়ে অন্ধকার চলল। কখনো আবার ফোক্কোরি করে—একবার অন্ধকার করে দিয়ে, ১৫ মিনিট পরে আবার জ্বেলে দিয়ে, আবার ১০ মিনিট পরে নিভিয়ে দিচ্ছে। এ সব কি বলতো!

---

* মনঃ সমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়

বাজারে কেরোসিন পাওয়া যায়না। সাতদিন লাইন দিলে যাও বা সামান্য মেলে তাতে একটা বাতি কয়েক ঘণ্টা জ্বালানো চলে। মোমবাতির দাম এত বেশী যে কেনা সম্ভব নয়। আলোও এত কম হয় যে লেখাপড়া করা অসম্ভব। বাড়ীতে আর ৪জন লোক আছে তাদেরও তো আলো দরকার, কিন্তু পাবো কোথায়? ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা আছে, স্কুল-কলেজ আছে—পড়বার উপায় নেই। কেরোসিন নাকি চালান আসছে না। বিদেশের সাহায্য না পেলে আমাদের ঘরে শিবের সলতে জ্বলবে না। তারপর রেল চলে না, কর্মীদের ধর্মঘট, যাত্রীদের ইচ্ছে-মত রেল চলে না বলে লাইনে বসে থেকে গাড়ী চলা বন্ধ করা, ষ্টেশন লুটপাট, ভাঙ্গাচোরা, তছনছ, তার কেটে ফেলা, সব মিলে রেল চলাচল বিপর্যস্ত। তাই কয়লা আসে না, তেল আসে না, চাল ডাল আনাজ কিছুই ঠিকমত সরবরাহ হতে পারে না। রেশনের দোকানে বরাদ্দ মাপা চাল গম তাও মেলে না। খোলা বাজারে কেনবার উপায় নেই, সামর্থ নেই। কয়লার অভাবে, তেলের অভাবে কল চলে না—বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না, অন্যান্য কল চলে না বলে জিনিষ তৈরী হয় না—বাজার তাতে শুকিয়ে যাচ্ছে—ব্যবসা বানিজ্য—বন্ধ হয়ে আসছে, দেশে টাকা আসছে না।

কলের মালিকরা কল চালাতে পারে না বলে মজুর ছাঁটাই করছে বা ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে। লোকের রোজগার বন্ধ হচ্ছে—অরোজগারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—তাদের আর তাদের পোষ্যদের খাওয়াবে পরাবে কে? বড় বড় অফিসের প্রায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লেগেছে। ছোট আর মাঝারি ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বাজারে আগুন লেগেছে সব জিনিষের দামে। আয় নেই—ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আর রোজ খালি মিছিল আর অবরোধ-অভিযান চলছে।—

আজকাল'তো শিক্ষকরাও দিন-মজুরদের মত রাস্তায় মিছিল বের করছেন। তাতে পুরুষ-স্ত্রীলোক বলে আর বাছ-বিচার নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষণ বন্ধ করে রাস্তায় তাঁরা আন্দোলন স্থুরু করেছেন। তাঁদেরও এক কথা—টাকা চাই। ডাক্তার, ইনজিনীয়ার সব বড় বড় দায়িত্বপুর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁরাও সে দায়িত্ব অনায়াসে ঠেলে ফেলে দেশের ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের বেতন আর মর্যাদার মান বাড়াতে ধর্মঘট করে বসে আছেন।

এক রাজনীতির দল যুবকদের তোয়াজ করে চলেছেন, আরেকদল কৌশলে তাদের নিজের দলের সুবিধে করে নেবার কাজে লাগাচ্ছেন। আমাদের কেউ বা লাফ-ঝাঁপ করছে, কেউ মারধর করছে। কেউ বা মিটিং করছে। রাস্তার মোড়ে ভিড় জমিয়ে বেহিসেবী মন্তব্য করছে। পড়াশোনার পালা শিকেয় তোলা আছে। পরীক্ষার সময় স্বাধীনভাবে টোকাটুকি করবার সুযোগ না দিলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। পরীক্ষা বন্ধ, কর্তাদের ঘেরাও—যা-

খুশী তাই চলল। শিক্ষক পড়ান না—নিজেদের আত্মম্ভরিতা জাহির করে সময় কাটান আর একে অপরের বিরুদ্ধে দল পাকান। এইতো সাধারণ ছবি। ছাত্ররা শিখবে কাকে দেখে! বিশেষ খাতিরী ব্যাপারতো অকাতরে চলছে। যার যত বিদ্যে কম তার তত গর্জন বেশী। লেখাপড়া আর হবে কি করে! বিদেশী কর্তাদের লেখার থেকে ক' লাইন টুকে এনে ক্লাসে নোট লিখিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষার মান দেখানো হচ্ছে। দেশের টাকা যাচ্ছে ড্রেনের এঁদো জলে।

সহরে লোক গিজগিজ করছে। ট্রামে-বাসে ওঠবার উপায় নেই। সহরের উন্নয়ণ-পর্বের কল্যাণে যে দশা করা হয়েছে, তাতে পায়ে হেঁটে চলাও সহজ নয়। যদি একটু বৃষ্টি হয় তবে আর কিছু ভাববার অবসর থাকে না। সহরের অনেক বাড়িতে নোংরা জল উঠে আসে। যানবাহন চলাচল বন্ধ। ব্যাস, এদিকে কলকারখানায় অফিসে বা কলেজে, পরীক্ষার কেন্দ্রে সময় মত হাজির না হলে বিপদ। তাই নিয়ে আবার হাঙ্গামা। নাও এখন কোন দিকে কি করবে! অবস্থাটা এমন বাড়তে দেওয়া হয়েছে যে আর কোনও দিকে একপা বাড়ানোর উপায় নেই।

হ্যাঁ, সমস্যার সমাধান হবে কি করে? আমের চেয়ে আঁটি এখন বড় হয়ে গেছে যেমন দুর্নীতিগ্রস্থ দুর্বল শাসক, তেমন দুর্নীতিগ্রস্থ সাধারণ মানুষ। দেশের এ অবস্থায় চট্ করে কিছু হওয়া কি সম্ভব! জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—দেশের খাবার আজ সে পরিমান জোটানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বার্থপর বিদেশীদের নানা ক্রুর খেলা'তো চলছেই। যে কোনও সময় দেশের মধ্যে গোলমাল—বাইরে থেকে আক্রমন চাপিয়ে দিয়ে আমাদের উন্নতির চেষ্টায় যত রকমে পারে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের স্বার্থ তারা দেখছে। দোষ দিয়ে কি হবে, আমাদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করতে না পারলে অন্যে তার জন্যে দায়ী হবে কেন?

আমাদের ধন গেছে, নীতি গেছে, আদর্শ গেছে, বেঁচে আছে কেবল লোভ আর অহংকার। এদিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না—বিশৃঙ্খলা দুর করতে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। তার জন্য যদি কিছু দুর্বৃত্তের ধ্বংস করবার প্রয়োজন হয় তাও সাহসের সঙ্গে করতে হবে কালোবাজারীদের, মুনাফাবাজদের আর একদিনও সহ্য না করে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এসব যদি সরকার নিজে না করে জনতার উপর ছেড়ে দেন তবে দেশে অরাজকতা দমন করা যাবে না। দেখতেই পাচ্ছ, দেশ সেই দিকেই যাচ্ছে। সময় মত ঠিক মত অন্যায় দমন যেমন করেই হোক করতেই হবে। তারপরে আসবে আদর্শানুসারে গড়বার কাজ। আদর্শ ঠিক করতে হবে। মানুষ চাই। কেবল দলের

লড়াই নিয়ে দেশ শাসন করা চলে না—উন্নতি করা তো নয়ই। সকলের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে হলে জনসংখ্যা যেমন করে হোক কমাতেই হবে। বাধ্যতামূলক জন্ম-নিয়োধের ব্যবস্থা নিতেই হবে। তা না হলে উপায় নেই। মানুষের খেয়াল-খুশীর উপর এতবড় বিষয় ছেড়ে দেওয়া এই প্রায় অশিক্ষিত দেশে চলতে পারে না—কঠোর হতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কোন বিদ্যালয়ের শেখানোর কথা বলছি না। সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বোঝাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান কথা মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শেখাতে হবে। সহজ কাজ মোটেই নয়, তবু তা করতে হইবে। কেবল ভাঙবার নেশায় মাতলে চলবে না। গড়বার দিকেও নজর দিয়ে চলতে হবে। দেশের যাঁরা জ্ঞানী-গুণী আছেন তাঁদের কাছ থেকে সরকারের উপদেশ নিয়ে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। শাসক-গোষ্ঠির হলেই সে কিছু সব-জান্তা হতে পারেনা। তাদের নিজেদেরও সে কথা বোঝবার, সেই অনুসারে মেনে চলবার শিক্ষা নিতে হবে। তা না হলেও আর উপায় নেই। বিপ্লব হলেও এই পন্থাই নিতে হবে— তা সে যে দলেরই দখলে দেশ শাসনের ভার আসুক না কেন। তোমাকে তো কতবার বলেছি......"

এক নাগাড়ে অনেক কথা শুনিয়া সেখান হইতে বাড়ি চলিয়া আসিয়াছি। আরও কত কথা হয়ত হইয়াছিল আর শুনিবার মত মন ছিল না—এলো-মেলো কথাগুলির মধ্যে কোথাও যেন গূঢ় সত্য নিহিত আছে এই বিশ্বাস লইয়াই বক্তা নিজের কথা বলিয়া গিয়াছে। আমি তার কিছু শুনিয়াছি।

ধৈষণা

তরুণচন্দ্র সিংহ

নব-বর্ষকে স্বাগত জানাই।

আশা না থাকিলে জীবনের রস-স্বাদ থাকে না, বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহও লোপ পাইয়া যায়। অতীত যেমনই হউক না কেন তবু সে অতীত। প্রতি মুহূর্তে বর্তমান অতীতে ঢলিয়া পড়িতেছে। বর্তমান ক্ষণিকের, অতীত সেই তুলনায় অনেক বেশী বড় ভাণ্ডার। সেখানে কত ইতিহাস, কত সুখ-দুঃখের কথা, কত সফলতা-বিফলতার স্মৃতি, কত পাওয়া কত না-পাওয়া, কত সঞ্চয়ের, কত ক্ষতি ও হারানোর কাহিনী জমা হইয়া আছে। সেইসব স্মৃতি কখনো বা উজ্জ্বল রং ছড়াইয়া বর্তমানকে ঝলক লাগাইয়া যায়, আবার কখনো কোনও বিষাদ মলিন ছায়া মনকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। বর্তমান ক্ষণিকের হইলেও তাহা অতীতের প্রসাদবিরহিত নহে। পিছনে যাহা ফেলিয়া আসা হয় তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। বর্তমানকে সেও কিছু দেয়। সে দান নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া আমরা বর্তমানকে দেখি আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ছক কাঁটি। এও এক রকমের স্বপ্ন দেখা। আমরা অতীতের স্বপ্ন যেমন দেখি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখি। বাঁচিয়া থাকার পথে প্রতিদিনের যত দ্বন্দ্ব-সমস্যা সে সবই এই আশা আমাদের অনায়াসে কাটাইয়া দিবার, ভুলাইয়া দিবার যাদু সামনে মেলিয়া দেয়। সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার কিনারায় এই আশার সোনালী আলো মাখাইয়া দেয়। আমাদের শত দুঃখেও তাই বাঁচিবার, উঠিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা করে। সম্মুখে তাকাইয়া, শূন্যে হাত বাড়াইয়া, কিছু পাইবার জন্য চলিতে থাকি। কত চাই ? তাহার কিছু বা পাই অনেকই পাই না। তবু চাই, তবু আশা করি, তবু চলি !

একটা বৎসরও কাটিয়া গেল। অতীতের ভাণ্ডারে আরও একটা বৎসর জমা হইল। তাই বলিয়া ভবিষ্যতের ভাণ্ডার হইতে কিছু কমিয়া গেল এমন কথা বলা যায় না। অতীত যেমন অনাদি, ভবিষ্যত তেমনই অনন্ত। মাঝখানে এই বর্তমানটাই ক্ষণিক। কিন্তু অতীত এই ক্ষণিকেরই মালা গাঁথা, ঐশ্বর্যে পুষ্ট, অনাগত অনন্ত ভবিষ্যত এই ক্ষণিক বর্তমানের প্রকাশের জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষারত। এই বর্তমানে দাঁড়াইয়া মানুষ একদিকে অতীত ও অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া চলে। এই দুই দিক হইতেই

সে জীবনের রস, জীবনের সম্পদ ও শক্তি আহরণ করিয়া চলে। জীবন তাই পরিমাপহীণ বিস্ময়ভরা, সেখানে কেবল দেখা-শোনা। অনুভব করার অফুরন্ত স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতে কত ঢেউ, কত বুদ্বুদ, কত রং-রেখার সৃজন অবিরাম ধারায় চলিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৃজনের শেষ নাই, মানুষের সৃজনেরও শেষ নাই। মহাকালের এ লীলার ছন্দে জগৎ-জীবন দোলায়িত। ইহার কোনও পরিমাপ করা চলে না। কত যুগ-যুগ ধরিয়া কত পাওয়ার সাথে কত না-পাওয়া মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। হাসি-কান্না এক সঙ্গে গলিয়া মিলিয়া এক অরূপের সৃষ্টি করিয়াছে। অতীতের এক বিশেষ শক্তি আছে। বর্ত্তমানে যাহা দুঃসহ, কদর্য, গ্লানিকর মনে হয় অতীত তাহাকেও রসসিক্ত করিয়া তুলিতে পারে। খণ্ডকে অখণ্ড, পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। বর্ত্তমান যেমনই হউক তাহা অতীতের ভাণ্ডারে যাইয়া আমাদের জীবনে রসের জোগান দিতে পারে, অতীত তাই জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবার পাথেয় জোগায়। আশা লইয়া মানুষ সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে।

আরও একটা বৎসর কাটিয়া গেল। কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, স্বভাবতই তার হিসাব করিতে চায় আমাদের ভয়ার্ত হিসাবী মন। কিন্তু সে হিসাব কোনো দিনই শেষ হয় না, হিসাব মেলে না। ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতার মত জীবনের হিসাব লেখা চলে না। জীবনে ক্ষণিকের মূল্যও অনন্ত হইয়া যায়, সামান্য সেখানে অসীম হইয়া যাইতে পারে, কণিকা মণিকা হইয়া দেখা দিতে পারে। কোন হিসাবী তার হিসাব রাখিতে পারিবে! কৃপণের মত সে চেষ্টা করিয়া লাভ নাই, তাহাতে বর্ত্তমানটাকেই অকাল-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। এই অপমৃত্যুর দিকে তাই পা বাড়াইব না। সহজ খোলা মনে নববর্ষকে আহ্বান জানাই, সম্ভাষণ জানাই। আশার অরুণাঞ্জন মনে মাখিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিব, বর্ত্তমান তাহাতে সহজ হইবে, মধুর হইবে। বন্ধুর বিধুর পথে চলিতে হইলেও অতীতের রসসম্পদ আমাদের পাথেয় জুটাইবে। নববর্ষকে স্বাগত জানাই।

এই চিত্ত পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও আমরা অনেক পাইয়াছি; অনেক সম্পদ লাভ করিয়াছি, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছি। আমাদের গত ১৫ বৎসরের চেষ্টায় যে কয়েকজন নিষ্ঠায় নিজেদের বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তা আমাদের পাঠকদের মনে নূতন চিন্তার সহায়ক হইয়াছে, নিজেদের ভুল ত্রুটি বুঝিবার, নূতন সৃজনশীল পথে চলিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের সেই অবদান সামান্য নহে। সাধ্যমত আমরা আরও চিন্তাশীল জ্ঞানী-গুণীদের নিকট হইতে সম্পদ লাভের চেষ্টা করিয়া চলিব। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও

প্রায় অরাজক অবস্থার কথা বলিয়া লাভ নাই, এ সম্বন্ধে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের মারফৎ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কম-বেশী সকলেই জানি। এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের বাঁচিতে হইবে, এবং ভবিষ্যতে যাহারা বাঁচিবে তাহাদেরও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। সকলের কাছে এই বিষয়ের সুস্থ চিন্তা ও মনোবল আশা করা যায় না। কিন্তু সর্ব কালেই এমন কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁহারা জীবনের সম্পদ-গৌরব ও সৃজনের শক্তিকে রক্ষা করিয়া চলেন ও সাধারণের মধ্যে তাহার প্রকাশ ও প্রচার করিয়া চলেন। সকল অবস্থায় সকল সময় তাঁহাদের সেই চেষ্টার স্পষ্ট ফল চোখে পড়ে না। এমন কি সকল চেষ্টাই ব্যর্থ এমন কথাও মনে হইতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা ভুল। দুর্দিনে কোথাও কোনও একটি প্রদীপও যদি জ্বালা থাকে তবে সময় মত তাহা হইতে হাজার বাতি জ্বালাইতে অসুবিধা হয় না। আর কিছু না থাকুক অন্ততঃ চকমকি পাথরখণ্ডকে রক্ষা করারও অশেষ মূল্য আছে। তেমন দুর্দিন যদি সত্যই ঘনাইয়া আসে তবু আমাদের চকমকি পাথরের খণ্ডগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। কালের কবলে পড়িয়াও তাহা অজেয়, অব্যয়। সত্য অমর। জ্ঞান অমর। সত্য, জ্ঞান ও কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাই।

নিয়মাবলী

- 'চিন্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

- 'চিন্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

- লেখকদের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়; লেখকের অনুরোধসাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্‌ প্রিণ্টও দেওয়া হয়।

- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

১৪, পার্শিবাগান লেন

কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

ষোড়শ বর্ষ　　চিত্ত　　প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় * ১৩৮১

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। নির্বিশেষ তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি অনুসৃত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হইবে না।

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Maharaja Printing Works, 5/1, Cornfield Road, Calcutta-19.

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা



সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

ষোড়শ বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১ দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

স্থাপিত—১৯২২

'চিত্তে'র সম্পাদনা-পর্ষৎ

সম্পাদক

ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ

সহ-সম্পাদক

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখার্জি
শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জি

সহযোগিবৃন্দ

ডঃ এস, জেড, অগেল
অধ্যাপক জি, এম, কার্সটেয়ার্স
ডঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রী সি, ভি, রামানা
ডঃ প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জি
ডঃ শিবকুমার মিত্র
ডঃ এন, জে, কোঠারী
ডঃ কে, ভাস্করণ
ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি

পরিচালক সমিতি

ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী
শ্রীমতী এফ, পি, মেহতা
ডঃ সুবিমল দেব
শ্রীমতী পুষ্পা মিশ্র
শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জি
ডঃ টি, কে, চ্যাটার্জি
শ্রীশরদিন্দু ব্যানার্জি
ডঃ এম, এম, ত্রিবেদী
শ্রীধনপতি বাগ
ডঃ এইচ, পি, মিত্র
শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল
শ্রীবিশ্বনাথ সেন
শ্রীমতী হাসি গুপ্ত

সঞ্চল স্মৃতি

রমেশ দাশ *

যেখানে মৌচাক বাঁধে মৌমাছিরা, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত দূরদূরান্তের পুষ্প-বনে মধু আহরণ করতে যায়। নতুন নতুন পথে যাত্রা করলেও মৌচাকে ফিরে আসতে কিন্তু তাদের পথ ভুল হয় না। যে পথ দিয়ে যায় সে পথ দিয়েই তারা আবার ঠিক ফিরে আসে। মৌমাছিদের মতো পিপীলিকারাও খাদ্য সন্ধানে নিত্য-নতুন অভিযান করে নতুন নতুন পথে, কিন্তু ঘরে ফেরার পথ তাদের ভুল হয় না কোনদিন। যে পথ দিয়ে যায় ঠিক সেই পথ বেয়েই ফিরে আসে ঘরে। কীটপতঙ্গের মতো পশুপাখীর ক্ষেত্রেও এই বিস্ময়কর ক্ষমতাটি দেখতে পাওয়া যায়। সুদূর সাইবেরিয়ায় যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে তখন যাযাবর পাখীরা অনেক নীচে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ মণ্ডলে নেমে আসে, ঠাণ্ডা কমলে আবার তারা ফিরে যায় প্রিয় প্রদেশ সাইবেরিয়ায়। কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রতি বছর শীতকালে তাদের একাংশকে নিয়মিত আসতে দেখা যায় অনেকেই তা লক্ষ্য করেছেন। আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে একটি পোষা টিয়া ছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম গঙ্গারাম। গঙ্গারাম এতই পোষ মেনেছিল যে তাকে দাঁড়ে বেঁধে রাখার দরকার হতো না। সে মুক্ত অবস্থায় ঘরময় ঘুরে বেড়াত, ইচ্ছেমত বাইরে উড়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি যেত, আকাশে উড়ে বেড়াত, গাছপালার মগডালে বসে দোল খেত আবার খাবার সময় হলে কিংবা সন্ধ্যে নামলে বাড়ি ফিরে আসতো। গঙ্গারাম আমাদের সংসারের একজন হয়ে গিয়েছিল, তাকে ছাড়া আমাদেরও চলতো না। কিন্তু মাঝে মাঝে গঙ্গারামের কী যে হতো। দিনের পর দিন তার আর পাত্তাই মিলতো না। আমরা মন খারাপ করে বসে থাকতাম, চারপাশে ছুটোছুটি করে অথবা লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নিতাম। বেশ কিছুদিন পরে হয়তো খবর পেলাম দুতিনটে গাঁ ছাড়িয়ে আর এক গাঁয়ে কোন একজনার বাড়ির আনাচে কানাচে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। খবর পেয়েই ছুটতাম সেখানে। গঙ্গারাম আমাদের দেখতো কিন্তু ধরা দিতনা, পালিয়ে যেত। কিন্তু বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরে আশ্চর্য হয়ে সানন্দে লক্ষ্য করতাম আমাদের ফিরবার আগেই গঙ্গারাম বাড়ি পৌঁছে গেছে। এ ব্যাপারে বেড়ালের কেরামতি বোধ করি সবাইকে

*অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা সংস্থা, ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ, কলিকাতা।

হার মানায়। গৃহস্বামী বিরক্ত হয়ে তস্কর বেড়ালকে বস্তাবন্দী করে তিন চার মাইল দূরে ছেড়ে এসেছেন, নিশ্চিন্ত বোধ করছেন উৎপাত বিদেয় হলো বলে। কিন্তু হায়! দিন কয়েক পরেই দেখা গেল মূর্তিমানের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা একেবারেই বিরল নয়। গাড়ির বলদের এ ধরনের ক্ষমতার কথা পল্লীবাসী মাত্রেরই জানা আছে। দূর শহর থেকে মাল বোঝাই গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান বাড়ি ফিরছে। দু'চোখ ভরে তার রাজ্যের ঘুম নামলো। গাড়িতেই শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু গাড়ি ঠিক পথ ধরেই যথা সময়ে বাড়ি পৌঁছে গেল। এটা একটা অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ইষ্টিশন থেকে বারো মাইল দূরবর্তী মামাবাড়ীর গাঁয়ে যাচ্ছিলাম গোরুর গাড়ি চড়ে। ধু-ধু করা প্রান্তরে যখন পৌঁছলাম তখন অকস্মাৎ কালবোশেখীর ঝড় উঠলো। কী দুরন্ত সেই ঝড়! গাড়ি উল্টে পড়লো। আমরা ঝড়ের প্রচণ্ড ঠেলায় উড়ে চললাম। বলদগুলো কোথায় গেল কে জানে। আধঘণ্টা পরে আমরা একটা গাঁয়ে এসে ঢুকলাম। তখন ঝড় থেমে গেছে, প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। পরের দিন যখন হেঁটে মামাবাড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি তার আগের রাত্রেই বলদগুলো বাড়ি ফিরে গেছে।

কী করে এমন হয়? কীট পতঙ্গ পশুপাখীর মতো নিম্নস্তরের প্রাণী যাদের মস্তিষ্ক নিতান্তই অনুন্নত, পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ তাদের পক্ষে পথের নিশানা সতর্কভাবে লক্ষ্য করা এবং চিনে রাখা কি সম্ভব? বস্তাবন্দী বেড়ালের পক্ষে তো পথের নিশানা লক্ষ্য করে মনে করে রাখবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাহলে কেমন করে এইসব প্রাণী দলিত পথ দিয়ে আবার ফিরে আসে নিজের আশ্রয় নীড়ে? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এটা সম্ভব হয় সঞ্চল স্মৃতির (Kinaesthetic-memory) সাহায্যে।

অঙ্গ সঞ্চালনের (movement) যে অনুভূতি বা সংবেদন (sensation) তার রেশটিকে বলে সঞ্চল স্মৃতি। মনে করা যাক মৌমাছি 'ক' বিন্দু থেকে যাত্রা সুরু করে বরাবর পাঁচ মিনিট উড়ে চলার পর ডান দিকে বাঁক নিয়ে সোজা উড়ে চললে তিন মিনিট ধরে, তারপর বাঁদিক ঘুরে দু'মিনিট উড়ে যাবার পর 'খ' নামক একটি মধুপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলে এসে বসলো। এই অভিযাত্রার ফলে তার গতি পথের (সময়, দিক ও বাঁকের) একটি ছাপ পড়লো তার গহন সত্তায়। এই ছাপটাই তাকে 'খ' থেকে 'ক' বিন্দুতে ফিরে যাবার একটা অন্ধ অথচ নির্ভুল প্রেরণা জোগাবে। দম দেওয়া যন্ত্রের স্প্রিং যেমন পাকে পাকে খুলতে থাকে তেমনি ফেরার পথে মৌমাছি উল্টো দিকে প্রথম দু'মিনিট সোজা উড়ে গিয়ে ডান দিক ঘুরে তিন মিনিট উড়বার পর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে পাঁচ মিনিট উড়ে চলার পর ঠিক এসে পৌঁছে যাবে তার

মধুচক্রে। সে এ কাজটা করবে যন্ত্রবৎ নিছক দৈহিক অনুভূতির আবেশে, ভেবে চিন্তে নয়। সব কিছু মিলিয়ে সঞ্চল স্মৃতিকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গসঞ্চালনের অনুবোধ বা অনুবেদন বলা চলে। জীবজন্তুর আশ্চর্য সময়বোধ দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। যে কোন লোকই পরীক্ষা করে এটা দেখতে পারেন। বাড়ির পোষা পাখী বা কুকুরকে যদি পাঁচ ঘণ্টা অন্তর খাবার দেওয়া হয় তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে পাঁচ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হলেই তারা খাবার জন্য ব্যাকুল হবে, তিন ঘণ্টা অন্তর খাবার দিলে ঠিক তিন ঘণ্টা পর পর তাদের মধ্যে এরকম ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়বে—যে খাবার দেয় তার কাছে, যেখানে খাবার দেওয়া হয় সে স্থানে এবং যে পাত্রে খাবার দেওয়া হয় সেই পাত্রের কাছে এসে নির্দিষ্ট সময়ে তারা ডাকাডাকি সুরু করে দেবে।

নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা করে আবার সেখানে ফিরে আসবার অদ্ভুত ক্ষমতাটি কবিগুরু তাঁর "প্রত্যাগত" কবিতায় সুন্দর ভাবে বলেছেন—"হেথা ফিরিবার তরে হেথা হতে গিয়েছিলে……আমার প্রাঙ্গণদ্বারে যে পথে করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।" "পথিক" কবিতায় তিনি বলেছেন—"কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা।" পথের রেখা পথিকের চিত্তে আঁকা হয়ে যায়, সেই রেখা ধরে আবার সে ফিরে ফিরে আসে। বলা বাহুল্য একই পথ দিয়ে যত বেশী যাতায়াত হবে, চিত্তে আঁকা পথের রেখাটি তত বেশী গভীর হবে, ফলে আসা-যাওয়ার কাজটাও হবে তত সহজ আর নিখুঁত।

সঞ্চল-স্মৃতি যে শুধু কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীকেই চালিত করে তা নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও তার প্রভাবটি অপরিসীম। নিশিচারণ (Somnumbulism) তার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। ঘুমের ঘোরে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় কেউ কেউ রাতের বেলা (সাধারণতঃ) ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন, তারপর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে আসেন বাড়িতে। কিন্তু সবটাই করেন সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায়, অথচ পথ চলতে ভুল হয় না। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিদেশী কাহিনী আছে। দীর্ঘ অদর্শনের পর শহরের বন্ধু এসেছে পল্লীর বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে তার সাদর আমন্ত্রণে। পল্লীর বন্ধু ডাকসাইটে জমিদার, বিরাট অট্টালিকা, অঢেল জমিজমা, ফুল ফলের বাগান। অতিথির আপ্যায়নের ত্রুটি হয়না। পান-ভোজনের এলাহি ব্যবস্থা। বন্ধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিকে সব কিছু দেখায়, ঘোড়ায় চড়ে বাগান পুকুর দেখিয়ে আনে। তারপর অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুজনে প্রাণ খুলে কত গল্প করে, অবশেষে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে শুতে যায়। এমনি করে মহানন্দে কয়েকটা দিন কাটবার পর একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। অতিথি বন্ধু দিনে দিনে বিমর্ষ

হয়ে পড়তে লাগলো। বিষন্ন মুখে বসে থাকে কথা বলে না। কিসের দুশ্চিন্তা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। বহু অনুনয় বিনয়ের পর বললো—প্রত্যেক দিন যে 'পোষাক'-গুলি ছেড়ে সে শুতে যায়, সকালে উঠে দেখে সেগুলি চুরি গেছে, অথচ ঘরের খিল ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গৃহকর্তা ব্যাপারটা কী জানবার জন্য একদিন অতিথি বন্ধুর কাছে একদিনের জন্য বিদায় নিয়ে তার অজান্তে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। রাত্রিবেলা বন্ধু যথা সময়ে ঘরে ঢুকে পোষাকগুলি ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে ঘরে খিল এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। অনেক রাত্রে গৃহকর্তা সবিস্ময়ে দেখলো বন্ধু শয্যা ছেড়ে আলো জ্বাললো তার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, চোখ মুখের চেহারা অস্বাভাবিক। সে ধীরে ধীরে পোষাকগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৃহকর্তা তার পিছু নিল। সে দেখলো এক মাইল দূরে একটা ফলের বাগানে ঢুকে বন্ধু মালীর কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি কুপিয়ে গর্তের ভেতর নিজের পোষাকগুলি রাখলো, তারপর সেগুলি মাটি চাপা দিয়ে আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে. আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পডলো বিছানায়। সকালে যথারীতি ঘুম ভেঙে দেখলো তার পোষাক নেই, সুতরাং বিষন্ন বদনে খাবার টেবিলে এসে বসলো। গৃহকর্তা তখন ধীরে ধীরে তাকে সব কিছু বললো। বাগানে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত হারিয়ে যাওয়া পোষাকগুলি তাকে দেখালো। এ ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিক অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু আমি আপাততঃ তার কথা এখানে বলছিনা, আমি বলছি বন্ধুটির বেহুঁস অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে ফিরে আসার কথা যা সঞ্চল স্মৃতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এ কাহিনীটি এক ধরণের মনোবিকারের উদাহরণ, কিন্তু সুস্থ মানুষও যে কখনো কখনো আচ্ছন্ন অবস্থায় নির্ভুল ভাবে জানা পথে চলতে পারে তার একটি নিদর্শন ছিল আমার মামাবাড়ির এক অতি পুরাতন ভৃত্য ভীম সিং, যাকে আমরা ভীমমামা বলে সম্বোধন করতাম। মামলা মোকর্দমার কাজে দাদামশাই প্রায়ই ভীমমামাকে চৌদ্দ-পনেরো মাইল দূরের এক কাছারিতে পাঠাতেন। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ চলা সহজ বলে ভীমমামা যথেষ্ট রাত্রি থাকতেই কাছারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পডতো। মাঝে মাঝে সঙ্গীও থাকতো দু-একজন। তারা বলতো, এবং ভীমমামাও স্বীকার করতো, যে সে বেশীর ভাগ পথটাই পাড়ি দিত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, তার সুশিক্ষিত পদযুগল কখনোই বিপথে যেত না, বিচ্যুত হতো না।

'কানামাছি' খেলার সময় ছেলেরা অনেকাংশে সঞ্চল স্মৃতির সাহায্য নেয়। অন্ধদের নিখুঁত গতিবিধি দেখে আমরা বিস্মিত হই। দেখতে না পেলেও তারা নির্দিষ্ট পথ

দিয়ে নির্ভুল ভাবে যাতায়াত করেন এবং বাড়ির কোথায় কি আছে সহজেই তার নাগাল পান। এটা স্পষ্টতঃই সঞ্চল স্মৃতির অপূর্ব কার্যকারীতারই নিদর্শন।

বস্তুতঃ সঞ্চল স্মৃতি যে আমাদের শুধু পথ চলতেই সাহায্য করে তা নয়, আমাদের অজস্র দৈহিক দক্ষতা গড়ে ওঠে তারই সাহায্যে। আমরা লিখতে শিখি, নাচতে শিখি, গাড়ি চালাতে শিখি, সাইকেল চড়তে শিখি—এই রকম আরও অসংখ্য দৈনন্দিন কাজে দক্ষতা অর্জন করি সঞ্চল স্মৃতির সাহায্যেই। বার বার 'ক' এই বর্ণটি লিখতে লিখতে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে ঠিক ভাবে হস্ত সঞ্চালন শুরু হলে পর নিভুল ভাবে বাকী সঞ্চালন গুলিও হয়ে যায়। বিশেষ তালে নাচতে আরম্ভ করলে নির্ভুল মাত্রায় পা গুলি পড়তে থাকে। যেখানে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন জড়িত, অথবা আগ্রহ খুব বেশী, সেখানে অভ্যেস না থাকলেও অঙ্গসঞ্চালনের পারম্পর্যে বড একটা ত্রুটি ঘটে না। সেই কোন শৈশবে সাঁতার শিখেছিলাম, তারপর দীর্ঘকাল সাঁতার কাটিনি, কিন্তু আজও জলে নামলে নিশ্চয়ই সাঁতার কাটতে পারবো।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সঞ্চল স্মৃতির প্রভাব তার ওপর তত বেশী। শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার পথরোধ করলে দেখা যাবে তারা বিভ্রান্তভাবে অসহায় হয়ে দিকভ্রষ্টের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। তার কারণ তাদের চিন্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা নেই। তারা চালিত হয় যান্ত্রিক তাডনায়। কিন্তু মানুষ যান্ত্রিকতা থেকে নিজেকে অনেকটাই মুক্ত করতে পারে তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। তার একটি দেহ আছে, তাই সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিকতা থেকে সে নিজেকে কখনোই মুক্ত করতে পারবে না। তাছাডা অজস্র প্রয়োজনীয় দক্ষতা যান্ত্রিকতার পথেই সুষ্ঠু ভাবে গডে ওঠে, তাই মানুষের জীবনে যান্ত্রিকতারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু যান্ত্রিকতা থেকে বিচ্যুতি তার জীবনে এনে দিয়েছে নব নব বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বপ্ন ও সাফল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ভুল" কবিতায় বলেছেন-- "অবমানিতা, জান না তুমি নিজে

মাধুরী এল কী যে

বেদনা ভরা ত্রুটির মাঝখানে"।

ত্রুটির মধ্য দিয়েই আসে নতুন প্রচেষ্টা, মহত্তর কৃতিত্ব। ভুল করে বলেই মানুষ এত বড হতে পেরেছে, পক্ষান্তরে ভুল করবার ক্ষমতা নেই বলেই মানুষের চাইতে অনেক বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েও মৌমাছি আর পিপীলিকারা এতটুকুও অগ্রসর হতে পারে নি।

মা ও শিশু

অমরেন্দ্র নাথ বসু*

কথায় বলে 'নাড়ীর টান'; মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর যোগ। এ যোগ ছিন্ন হবার নয়। সত্যই কি তাই? গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীরের অংশ হিসাবেই থাকে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য আলাদা ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় না; মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস। আলাদা ভাবে আহার করতে হয় না। মায়ের আহারই তার আহার। বেঁচে থাকার জন্য তার কোন প্রচেষ্টা নেই; মায়ের প্রচেষ্টাই তার প্রচেষ্টা। গর্ভাবস্থায় শিশু এই ভাবে মাতৃ-দেহে বসে পরিপুষ্ট হতে থাকে। তাই এই সময় মায়ের শরীরের সুখেই তার সুখ; মায়ের অসুস্থতা, তার আরামের বিঘ্ন।

কিন্তু জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ যোগ বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্ত থেকেই সে মাতৃ-শরীর থেকে পৃথক; শারীরিক একত্বের পরিসমাপ্তি; নাড়ীর যোগ ছিন্ন। তবুও নিজে নিজে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা শিশুর এই সময়ও কিছুই থাকে না। তাই মায়ের শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মায়ের উপর নির্ভরশীল তাকে থাকতেই হয়। তাই যে নির্ভরতা শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাকেই উন্নীত করতে হয় মানসিক বন্ধনে। প্রকৃতি শিশু ও মায়ের প্রবণতা ও আচার-আচরণের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যবস্থা করে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই মানসিক বন্ধন এবং শিশুর বেঁচে থাকার সর্তাবলী পরিপূর্ণ হয়। এ সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ একেবারে প্রবৃত্তিগত। মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর থেকে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ এ বন্ধন ছাড়া শিশু বাঁচতে পারে না। তাই এদিক থেকে যে সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় শিশুকে সাহায্য করে সেগুলির একটা উদ্‌বর্তন মুল্য (Survival value) রয়েছে।

মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর শাবকদের মধ্যে এরকম কতগুলি নিদিষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয়, যার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীটির মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ উদ্দীপিত হয় এবং যার ফলে মা-প্রাণী ও শাবকের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয় ও ফলে শাবকের বেঁচে থাকার

[* মনঃসমীক্ষক; শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়; অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।]

সর্তসমূহ পরিপুর্ণ হতে থাকে। এরকম ঘটনা প্রায় সকলেই দেখেছেন যে বাড়ীর গ্যারেজে বা দালানের আনাচে-কানাচে কয়েক দিনের কুকুর ছানাগুলো কুঁ কুঁ করে যখন আওয়াজ তোলে তখন মা-কুকুরটা দুরে থাকলে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ছানাগুলোকে আগলে ধরে ও মাই খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। যাঁরা গ্রামে থেকেছেন তাঁরা পাখীর বাসায়ও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। এই জাতীয় শব্দ করাকে আমরা কান্না নাম দিয়ে থাকি। এই কান্না মায়ের মনকে আকর্ষণ করে এবং তার মনে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে যার ফলে সে কতগুলি বিশেষ আচরণ করে থাকে অর্থাৎ কান্না ঐ সকল আচরণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। মায়ের কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণের ফলে শাবকের মধ্যে যে অস্বস্তিকর ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফলে কান্নারও পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটা সাম্য অবস্থায় ফিরে আসে। এই শাবক ও মায়ের আচরণ একই সুত্রে বাধা। আর এই বন্ধনের মুল উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষা বা উদ্‌বর্তন। প্রাকৃতিক পরিবেশে যাঁরা বানর ও বানর শাবককে দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শাবকটি মা-বানরের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকে। মা-বানরটিও বাচ্চাটিকে ধরে রাখে। মা-বানরকে জীবন সংগ্রামের তাগিদে গাছ থেকে গাছে খুব দ্রুত ছুটে চলতে হয়। সে অবস্থায় এই ধরে থাকার ও ধরে রাখার সহজাত ক্ষমতাটি ও ইচ্ছাটি চাই। শাবকের দিক থেকে এই আঁকড়ে থাকার প্রবণতার পরিতৃপ্তির অভাবে তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই শাবকের এই আচরণ মা-বানরের মধ্যে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণকে উদ্দীপিত করে। শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীদের শাবকদের মধ্যে এই আঁকড়ে থাকার বৃত্তিটি সমধিক চোখে পড়ে। এমন কি প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই সকল শ্রেণীর শাবকেরা মায়ের মাই চোষার ক্ষমতা লাভ করার আগেই মায়ের দেহ আঁকড়ে থাকার ক্ষমতাটি লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর শাবকেরা বিভিন্ন ধরণের কতগুলি প্রবৃত্তিমুলক আচরণ ও প্রতিবেদন (instinctive behaviour and response) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শাবকদের আচরণের প্রতিবেদনে মা কতগুলি আচরণ করে থাকে, মায়ের আচরণের প্রতিবেদনে শাবকেরা কতগুলি আচরণ করে বা পুর্ব আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যেমন মানব-শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় পর্যন্ত মায়ের অদর্শনে শিশু কাঁদছে, মা এসে তাকে আদর করল, কোলে তুলে নিল; তখন তার প্রতিবেদন হিসাবে শিশু কান্না থামিয়ে মুখ দিয়ে নানা রকম খুশির আওয়াজ করতে লাগল। মা তাকে আরো নানা ভাবে আদর করতে লাগল। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শাবকেরা যে সকল প্রবৃত্তিমুলক আচরণ ও প্রতিবেদন করে থাকে (যার উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার পথ সুগম করা), তার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীরা কতগুলি আচরণ করে থাকে।

এই ভাবে এই সকল আচরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কতগুলি মানস-বৃত্তিও গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবেই মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হতে থাকে।

মানব শিশুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার প্রথম আচরণ কান্না। জন্ম লগ্নে কান্নার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তার জীবনস্পন্দন। যে অস্বস্তিবোধ তার কান্না উদ্দীপিত করে, সেই কান্নাই তার ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের স্পন্দন ঘটায়, তার প্রতি মায়ের (বা মাতৃস্থানীয়ার) দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কাজেই মানব শিশুর ক্ষেত্রে কান্নাকেই মা-শিশু সম্পর্কের প্রথম আচরণ বলতে পারি। শিশু অস্বস্তি বোধ করলে বা যন্ত্রণা বোধ করলে কাঁদে, খিদে বোধ করলে কাঁদে। মায়ের স্তনের অনুভূতি, তার গায়ের স্পর্শ, গলার স্বর, এমন কি কেবল মাত্র তার উপস্থিতিই শিশুর কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই কান্নার মধ্য দিয়েই শিশুর অসহায় অবস্থা, তার নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়। এই কান্না মায়ের মনে কতগুলি ভাবের উদ্রেক করে এবং মাকে কতগুলি আচরণে উদ্দীপিত করে।

এর পরই আসে চোষার (sucking) আচরণ। মায়ের বুকের মাই চোষার মধ্য দিয়ে এর পরিতৃপ্তি। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তার সুখানুভূতি হয়। তবে চোষার প্রবণতার পরিতৃপ্তি বোতলের দুধ খাইয়ে, চুষিকাঠি প্রভৃতি দিয়েও ঘটান সম্ভব। কিন্তু মায়ের মাই খাওয়ার মধ্যে যে চোষার পরিতৃপ্তি তা কৃত্রিম উপায়ে ঘটান সম্ভব কিনা তা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই আঁকড়ে (cling) থাকার প্রবণতা। শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষায় জানা যায় যে জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর নিজের হাত দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে। শিশু যখন মায়ের কাছে শুয়ে থাকে তখন সে মায়ের কোলের মধ্যে আঁকড়ে থাকতে চায়, মায়ের আঁচল ধরে থাকে। কোনও শিশু অনেকক্ষণ ধরে তার মাকে পাচ্ছে না, তারপর যখন তাকে পায় তখন আর ছাড়তে চায় না, আঁকড়ে ধরে। মা-দের অনেক সময় শিশুকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায় (বিশেষ করে যখন কাজ-কর্মের তাড়া থাকে), "সব সময় পায় পায় ঘুরছে, গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকবে, কোন কাজ করার উপায় নেই।" খুব ছোট্ট শিশু ঘুম ভাঙ্গার পর যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত দু'খানা উপরে তুলে কাঁদছে। আমরা এর অর্থ করে নেই—কোলে উঠতে চায়। মা ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়। শিশু আর একটু বড় হলে কোলে ওঠার জন্য আরও স্পষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে দেয়। আঁকড়ে থাকার প্রবণতারই পরিণতি এই কোলে ওঠার আচরণ। শিশু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত হয়, কোন ব্যথা

পায় এবং ভয় পায় তখনই শিশুর মধ্যে এই আঁকড়ে ধরার প্রবণতা. প্রবল হয়ে ওঠে। মায়ের কোলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটে।

এসকল ছাড়া মানব শিশুর মধ্যে আরও দু'একটি বিশেষ ধরণের প্রবৃত্তিমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যেমন শিশুর হাসি, অপরের উপস্থিতি নজর করা ও অপরের নজরের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা। এ সকল আচরণগুলির মধ্যে দিয়েও মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়। ছ'সাত সপ্তাহ বয়স থেকেই শিশু মৃদু হাসতে পারে। মাকে আবদ্ধ করে রাখার এমন শক্তিশালী ক্ষমতা আর কী আছে! শিশু খুশিতে মৃদু হাসছে; মাও ঝুঁকে পড়ে তার প্রত্যুত্তর জানাচ্ছে, আদর করছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি মুগ্ধ। এমন অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে যে কোনও মায়েরই সুখ। শিশুর এই হাসির বিনিময়ে মা নিজেকে শিশুর ক্রীতদাসীত্বেও পরিণত করতে রাজী। ঐটুকু শিশুর কী অসীম ক্ষমতা! প্রকৃতি বেঁচে থাকার জন্য শিশুকে কী শক্তিশালী হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছে।

তিন-চার মাস বয়স থেকেই শিশু শুয়ে শুয়ে তার আশে-পাশের লোকদের চলা-ফেরার ও উপস্থিতির প্রতি খুব অল্পক্ষণের জন্য নজর রাখতে আরম্ভ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ক্ষমতা বাড়ে। শিশুর কাছ থেকে সরে গেলে সে বুঝতে পারে। তাকে একা রাখলে বুঝতে পারে। তখনই সে অপর কারুর উপস্থিতি চায়; কারুর নজরের মধ্যে আসতে চায়। শিশু যখন ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে ক্ষুধার্ত হয় তখনই সে অপরকে অনুসন্ধান করতে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে কেবলমাত্র মায়ের উপস্থিতিই তাকে শান্ত করে। এমন কি যদি সে মাকে দেখতে নাও পায়, কিন্তু তার কথা শুনতে পাচ্ছে, গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, তাহলেই শিশু পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর মায়ের নজরে থাকার এই প্রবণতার কতটা পরিতৃপ্তি ঘটল বা না ঘটল, তার সাথে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক উদ্বেগ বোধ করা বা না করার কিছু যোগ থাকতে পারে বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী অনুমান করে থাকেন। নজর পাওয়ার এই ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়ার প্রতিক্রিয়া মানসিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে দেখা দিতে পারে।

উপরে শিশুর যে সকল প্রবণতা ও প্রবৃত্তিমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করা হ'লো, সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার প্রত্যেকটিই শিশুর জীবনে কোনও না কোনও সময়ে শুরু হচ্ছে, আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে, আবার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মা ও শিশুর পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে এগুলির উদ্‌বর্তনের প্রয়োজনীতাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু যথা সময়ে মা বা মাতৃস্থানীয়া কারুর

মধ্য দিয়ে যদি এগুলির পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তি না ঘটে তাহলে শিশুর মানসিকতায় নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। শিশু প্রকৃতিদত্ত এই হাতিয়ারগুলি তার প্রয়োজনের তাগিদে. অর্থাৎ উদ্‌বর্তনের তাগিদে ব্যবহার করে। কিন্তু তাই বলে উদ্‌বর্তনের প্রয়োজনের শেষে এসকল হাতিয়ারের অর্থাৎ প্রবণতা ও আচরণসমুহের অবলুপ্তি ঘটে না। বয়স্কদের মধ্যেও এগুলি যেন কোষ-বদ্ধ অবস্থায় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমরা কি কাঁদি না? দারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে আমরা কি পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরি না? নিদারুণ একাকীত্ববোধের মধ্যে আমরা কি চাই না যে প্রিয়জন ও বন্ধুজন আমাদের ঘিরে থাকুক? আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক যুগলের আচরণের মধ্যেও এই সুপ্ত আচরণগুলির প্রকাশ সুখানুভূতিকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিশুর জীবনে এই সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমুহ প্রধানতঃ যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সে হ'লো মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন ব্যক্তি। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে এসকল আচরণসমুহ মাকে বাদ দিয়ে অপর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেমন চোষার আচরণের পরিসমাপ্তি দুধের বোতল বা চুষি কাঠির মধ্যে দিয়ে ঘটান হয়। আঁকড়ে থাকার আচরণটিকে বালিশ জড়িয়ে থাকার মধ্যে পরিচালিত করা হয়। আবার হয়ত এমন হতে পারে যে এক একটা প্রবণতার পরিতৃপ্তি এক এক জনের মারফত ঘটেছে। যেমন শিশু তার প্রকৃত (natural) মায়ের বুকের মাই খাচ্ছে; কিন্তু সারা দিনই তাকে আয়ার নজরের মধ্যে থাকতে হচ্ছে (যে সকল মা চাকুরী বা অন্য কাজের জন্য বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন তাঁদের শিশুর ক্ষেত্রে)। কিন্তু শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার পরিতৃপ্তির উৎস-বিন্দুকে যতই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করাই না কেন তার বেশির ভাগ প্রবণতাসমুহের পরিতৃপ্তি ঘটে মায়ের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই শিশুর জীবনে মা কেন্দ্রবিন্দু। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মায়ের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়েই সকল প্রবণতা সমুহের পরিতৃপ্তি ঘটা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্র-বিন্দু যতই বিভিন্ন হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি ততই বিনষ্ট হবে; কেবল মাত্র মাকে কেন্দ্র করে সকল প্রবৃত্তিমুলক আচরণসমুহের পরিসমাপ্তির মধ্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি নির্ভর করে। মায়ের স্থান এদিক থেকে অদ্বিতীয়। এর দ্বারা যেন এরকম মনে না করা হয় যে শিশু অপর কারুর সংস্পর্শে যাবে না। সকলের সাথেই তার যথাযোগ্য সংস্পর্শ থাকবে এবং গড়ে উঠবে। কিন্তু জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু থাকবে মা; এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি এই কেন্দ্রাভিমুখতা শিথিল হতে থাকবে। শিশু পালনের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থাই করতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে তীব্র মাতৃ-কেন্দ্রাভিমুখতা, যদি শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথেও শিথিল না হয়, তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পর শিশুর সাথে মায়ের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হলেও শিশুর কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও মাতৃনির্ভরতার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মানসিক যোগ গড়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব-শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে এসকল আচরণগুলি হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছে। এভাবে মা ও শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা আবেগ সঞ্চিত হয় এবং একটা মানসিক বন্ধন স্থাপিত হয়। শিশুর তিন-চার-পাঁচ বছরের সময় এই যোগ তীব্রতম হয়। এই যোগ শিশুর কিশোর জীবন পর্যন্ত কিছুটা থাকে। তারপর ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু মাতৃ-মূর্তির প্রতি আবেগ মানবমনে সমগ্র জীবন ধরেই প্রবাহিত হতে থাকে। সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। এদিক থেকে মায়ের সাথে শিশুর যোগ অবিচ্ছেদ্য।

(বিঃ দ্রঃ :— এই প্রবন্ধে 'মা' বলতে প্রকৃত মা (natural mother), বিকল্প মা বা মাতৃস্থানীয়া যে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝাবে।)

ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা

পুষ্পা মিশ্র*

মনঃসমীক্ষণের জগতে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান হল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের শৈশব-কাম সম্পর্কে মতবাদ। এবং এই মতবাদের মধ্যে তাঁর ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার মতবাদটি সমগ্র মনোচিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড তাঁর উন্মায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালীন জ্ঞাত ও প্রাপ্ত তথ্যের উপর মনোবিশ্লেষণের মূল সিদ্ধান্তগুলি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এই মূল সিদ্ধান্তগুলি তথাকথিত সুস্থ মানুষের মনোবিশ্লে-ষনের মাধ্যমে সমর্থিত হয়। ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তগুলি মানব মনের সাধারণ নিয়ম-রূপে ফ্রয়েড স্বীকার করেন। ইডিপাস-গূঢ়ৈষার মতবাদ নিয়ে সম্ভবতঃ ফ্রয়েডকে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। তবু সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়ই—অতএব ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার ধারণাটিকেও আজ অনেকে সহজভাবে গ্রহণ করে তার সম্পর্কে নানান অনুসন্ধান চালিয়ে তার গভীরতা, জটিলতা, বৈচিত্র্য, মানসিক রোগ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তার অবদান ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সাধারণভাবে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

আমরা যেমন এক প্রকার দৈহিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং তা যেমন শিশুর বয়সের ক্রমোন্নতির সঙ্গে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তেমনি আমরা এক মানসিক কাম-শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। এই মানসিক কাম-শক্তিকে বলা হয় libido। আমাদের সর্বপ্রকার সুখ ভোগের অন্তরালে যে মানসিক শক্তি কাজ করে, তাই হল লিবিডো। অর্থাৎ যে কার্যের সঙ্গে আমাদের মানসিক কাম-শক্তি জড়িত থাকে, যে কার্যে আমরা সুখ ভোগ করি, এবং যে কার্যের সঙ্গে লিবিডো যুক্ত হয়ে থাকে না, সে কার্যে আমাদের সুখ থাকে না। এই মানসিক কাম-শক্তি জন্মের পর হতে ক্রমপরিণতির কতকগুলো স্তর অতিক্রম করে অবশেষে তার লক্ষ্যে উপনীত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। লিবিডোকে যে স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়, তার প্রথমটি হল, মুখ-কাম। এই স্তরে শিশু মুখ্যত ঠোঁট, গলা ও মুখের মাধ্যমে সুখ উপভোগ করে। এর পরের স্তরটি প্রধানতঃ পায়ু-মুখের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—একে বলা হয়, পায়ু-কাম স্তর।

---

* মনঃসমীক্ষিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়া।

অতঃপর শৈশ্নিক দশা বা phallic phase অতিক্রম করে লিবিডো ঈডিপাস-স্তরে এসে উপনীত হয়।

ঈডিপাস-স্তরে পৌঁছোবার পূর্বে ফ্রয়েডের মতে—শিশুর নারী ও পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় না। ঈডিপাস-স্তরে শিশু, প্রথমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। যদিও নির্দ্দিষ্ট কোন বয়সে শিশুর কাম-শক্তি এই স্তরে উপনীত হবে, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না তথাপি সাধারণতঃ আড়াই বৎসর থেকে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে এই গূঢ়ৈষার আগমন হতে দেখা যায়ঃ এই গূঢ়ৈষার মুখ্য উপাদান হল দু'টি— ১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার (parent) প্রতি যৌন-আকর্ষণ ও সমলিঙ্গের জনয়িত্রার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিরোধী মনোভাব যা অনেক সময় হত্যা করার ইচ্ছা পর্যন্ত উপনীত হয়। এখন দেখা যাক্, কি ভাবে এই ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে উদিত হয়।

শিশুর ব্যবহার একটু লক্ষ্য করলেই, শৈশব-কামের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। প্রাক্-ঈডিপাস অবস্থায় বা শৈশ্নিক স্তরে শিশুকে প্রায়ই লিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে দেখা যায়। অনুরূপ কার্য-গুলি প্রায়ই পিতা-মাতার দ্বারা নিন্দিত হয় এবং শিশুও ক্রমশঃ এগুলির নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর নিকট তার প্রধান ভালবাসার বস্তু হচ্ছে মা অথবা মাতৃস্থানীয়া। কারণ মা অথবা মাতৃস্থানীয়াই তার সকল চাহিদা পুরণ করছেন এবং শিশু তাঁর সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসছে। অর্থাৎ শিশু-সন্তান পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন প্রাক্-ঈডিপাস অবস্থায় মা অথবা মাতৃস্থানীয়ার প্রতিই তার কাম-শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক আরোপিত থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমাদের কাম-শক্তি বাস্তব বস্তু অথবা মানুষের প্রতি আরোপিত হয় না, হয় সেই বস্তু বা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক প্রতিরূপ (mental image) থাকে, তার উপর। এই সময় শিশুর যৌনাকাঙ্খা ক্রমশঃ জাগরিত হতে থাকে। পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে তার যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রধান কেন্দ্র স্বাভাবিকরূপেই তার মা অথবা মাতৃস্থানীয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। একদিক দিয়ে বলা যায়, তার বহু সুখ ও আরামের কেন্দ্র রূপে তার মাই ছিলেন তার ভালবাসার প্রধান বস্তু। যৌনতৃপ্তির প্রশ্ন উঠলে কার্যতঃই তার মাকে ঘিরেই তার আবেগ প্রথম জাগরিত হয়। শিশু তার স্বল্পপরিণত বুদ্ধি দিয়ে এটুকু ধরতে সক্ষম হয় যে পিতার সঙ্গে মায়ের এক বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং মায়ের উপর পিতার দাবী তার চেয়ে অনেক বেশী। মায়ের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা কিরূপ তা নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতার উপর। যদিও যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়—তবু নিজের শরীরে নিজে সে যে যৌন-সুখ অনুভব করে, অস্পষ্ট ধারণায় পিতা-মাতা সম্বন্ধে সে কথাগুলি তার মনে উদিত হওয়া সম্ভব। অনেক

সময় শিশু সন্তানের জন্মের সঙ্গে পিতার যোগাযোগ অনুভব করতে পারে এবং পিতার মত হয়ে মাকে সন্তান দেবার ইচ্ছাও ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার একটি অঙ্গরূপে প্রকাশ পেতে পারে পুরুষ-শিশু এই স্তরে বিশেষ করে মায়ের প্রশংসা ও ভালবাসা দাবী করে।

মায়ের প্রতি এই আকর্ষণের সঙ্গে আরও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনে উদ্রিক্ত হয়—তা হচ্ছে পিতার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতার ভাব। শিশু যেহেতু মাকে চায় অতএব মায়ের প্রাত তার দাবী অগ্রগণ্য। মাকে শিশু পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে চায়। মা তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসবেন এ পরিস্থিতি শিশুর নিকটে পীড়াদায়ক। পিতা যেহেতু তার মাকে অধিকার করার পক্ষে প্রবল ও প্রধান বাধা, সুতরাং এই বাধার বিরুদ্ধে তার সমস্ত রাগ পরিচালিত হয়। সে মনে-মনে পিতার এবং অন্য ভ্রাতা-ভগ্নীর ধ্বংস কামনা করে।

এই প্রবল ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে এক প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ দুটি কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ শিশু পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিঘাতের আশঙ্কা করে। পিতা যদি তার ধ্বংসাত্মক যৌন-ইচ্ছাগুলি জানতে পারেন তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন—এই আশঙ্কা শিশুর মনে দেখা দেয়। পিতা-মাতাকে শিশু এই সময় তার নিজের ক্ষুদ্র শক্তির তুলনায় প্রবল শক্তিশালী মনে করে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর মনে পিতার প্রতি শুধুই যে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা বর্তমান থাকে তা নয়। পিতার শক্তি তার নিকটে বিস্ময়কর ও প্রশংসার বস্তু। এতদ্ব্যতীত, পিতা-মাতার উপর শিশুর নির্ভরতাও রয়েছে। তাদের ভালবাসা বজায় রাখা শিশুর নিকট প্রায় জৈবিক প্রয়োজনের সামিল। ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি আক্রমণ-মুলক (aggressive) মনোভাবও যে পিতা-মাতার নিকট স্বীকৃতি লাভ করবে না, এ অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। সুতরাং শাস্তি এবং পিতা-মাতার ভালবাসা হারানোর ভয়—এই দুই মনোভাব শিশুর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কি ধরণের শাস্তির ভয়, শিশুর মনে সর্বাপেক্ষা প্রবল—মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে তাও জানা গেছে। রোগীর মনঃসমীক্ষণ, বিভিন্ন দেশের আচার-অনুষ্ঠান, গল্প, রূপকথা, পৌরাণিক কথা ইত্যাদির মাধ্যমে এ তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, শিশুর মনে যে শাস্তির প্রবল ভয় বিদ্যমান থাকে, তা হচ্ছে উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কা (castration fear)। এই আশঙ্কা কতকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত কিছু বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হস্তমৈথুন থেকে বিরত করার জন্য অনেক সময় পিতা-মাতা শিশুকে উপস্থচ্ছেদের ভয় দেখান। ছোট্ট মেয়েকে দেখে, পুরুষ-লিঙ্গ ছাড়াও যে মানুষ থাকে, সে সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়। অতএব, সে প্রকৃতই উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে এই castration fearই হচ্ছে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধানের উপায়। এতগুলি ভয় আর

আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে শিশুর পক্ষে এই ঈডিপাস-ইচ্ছা গুলিকে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। অতএব, এই সকল ইচ্ছার কিছু অংশ ত্যাগ করে এবং কিছু অংশ অবদমিত করে—অর্থাৎ তার নির্জ্ঞান মনের দুরতিগম্য স্তরে প্রেরিত করে। এই অবদমনের সঙ্গে শিশুর আনুষঙ্গিক শৈশব-কামও দমিত হয়। এই কারণে আমরা সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়সের পূর্ব্বের ঘটনাগুলি মনে আনতে পারি না। ফ্রয়েড এই বিস্মরণকে শৈশব-অন্মার বা infantile amnesia বলেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুষ শিশুর ঈডিপাস-গূঢ়ৈষায় দু'টি অনুভূতির প্রাধান্য থাকে—(১) মায়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা, (২) পিতাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা। এই দু'টি মূল অনুভূতির সঙ্গে থীব্‌সের রাজা ঈডিপাসের কাহিনীর সাদৃশ্যের জন্য ফ্রয়েড এই গূঢ়ৈষার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা। ঈডিপাস জন্মকালে তার পিতা-মাতা, থীব্‌সের রাজা ও রাণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এক মেষ পালকের নিকট মানুষ হয়েছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে তিনি নিজের পিতাকে বধ ও মাতাকে বিবাহ করতে বিধিনির্দ্দিষ্ট, তখন মেষপালককে নিজের প্রকৃত পিতা ভেবে সেখান থেকে পলায়ন করেন। পথে দস্যু ভ্রমে থীব্‌সের রাজা অর্থাৎ নিজের প্রকৃত পিতাকে হত্যা করেন এবং থীব্‌সের রাণী অর্থাৎ নিজের মাতাকে পরিচয় না জেনে বিবাহ করেন। অনেক পরে তিনি যখন প্রকৃত সত্যটি অবগত হলেন, তখন রাগে, দুঃখে নিজের দুই চোখ অন্ধ করে ফেলেন ও রাজ্য পরিত্যাগ করেন। ফ্রয়েড বলেন যে ঈডিপাসের করুণ কাহিনী [১] যে আমাদের মনের গভীরতর স্তরে নাড়া দিতে সক্ষম, তার কারণ আমরা মনে-মনে সবাই এক একটি ঈডিপাস। আমরা আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে পিতাকে ধ্বংস ও মাতাকে ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করি।

দেখা যাচ্ছে, মানসিক কাম-শক্তির বিবর্ত্তনের দিক দিয়ে এই স্তরটির গুরুত্ব অসীম। এই স্তরে শিশুর মানসিক জগতে নানান্ অনুভূতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্নতা এক জটিলতার সৃষ্টি করে। এই কারণে এই স্তরকে Œdipus-complex নাম দেওয়া হয়েছে। উন্মায়ু-রোগের একটি কারণ স্বরূপ এই গূঢ়ৈষার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ উন্মায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালেই এই তথ্যগুলি ধরা পড়ে। ফ্রয়েড তাঁর মহিলা উন্মায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালে অনেকের নিকট হতে অভিযোগ শোনেন যে তাঁরা তাঁদের পিতা কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছেন। বাস্তবক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে এই সকল অভিযোগগুলি ভ্রান্ত ও কাল্পনিক। কিন্তু ফ্রয়েড এরই মধ্যে উন্মায়ু-রোগের কারণের সন্ধান পেলেন। যা ঘটেনি, রোগী তার মানসিক জগতে তাই

১ এই ঘটনাক্রম পুরুষ-শিশুর প্রতিই প্রযোজ্য।

ঘটিয়ে চলেছে—এবং এর পশ্চাতে নিশ্চয় কোন মানসিক উপাদান ক্রিয়াশীল। গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে এই ঘটনাগুলির অন্তরালে রোগীর তার পিতার প্রতি যৌনাকাঙ্খা ও মাতার প্রতি গভীর আক্রোশ প্রকাশ পায়।

ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা সমস্ত উদ্বায়ু-রোগের মূল কারণ। পরিণত বয়সে যৌন বস্তু (sex object) নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে এই গূঢ়ৈষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা।

ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার গুরুত্ব অন্য কারণেও অপরিসীম। ফ্রয়েডের মতে এই গূঢ়ৈষা থেকেই আমাদের অধিশাস্তা বা super-egoর জন্ম হয়। অধিশাস্তা হল সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে বিবেক বা আমাদের নৈতিক-বোধ বলে থাকি। যদিও ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের পূর্বেই পিতামাতা শিশুকে সাধারণভাবে নৈতিক শিক্ষা দিতে শুরু করেন, কিন্তু এই শিক্ষাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অথবা 'এটা নিও না, ওটা কোরো না'—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে শিশু শাস্তির ভয়ে অথবা পিতামাতার অসন্তুষ্টির ভয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণে বিরত থাকে। অর্থাৎ বিবেক বা নৈতিক-বোধের যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ—বাইরের শাস্তি নয়, অন্তরের আদেশে বিশেষ বিশেষ কার্য বা চিন্তায় বিরত থাকা—তা এ স্তরে অনুপস্থিত থাকে। ঈডিপাস-স্তরে যখন বহু বিচিত্র ও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনকে নাড়া দিতে থাকে ও শিশু সেগুলির হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় খোঁজে, তখনই অন্তঃস্থিত নীতি-বোধের গঠন আরম্ভ হয়। যখন শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে যে মা তার ইচ্ছাগুলি পূরণ করবেন না, তখন তার মানসিক প্রবণতা আবার পিতার প্রতি ধাবিত হয়। পিতার প্রতি তার যে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাগুলি জেগে ছিল, সেগুলির কিছুটা সে সমাধান করে, পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ (Identification) করে। অর্থাৎ মাকে পাবার ইচ্ছা সে ত্যাগ করে 'বাবার মত হব' —এই আশায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় শিশু-মনের এই ইচ্ছা অতি সুন্দর ও সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণের সময়, শিশুর আচরণে পিতার আচরণ, হাঁটা-চলা, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির অনুকরণ করার প্রবণতাও একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। এই একাত্মীকরণের ফলে পিতা-মাতার বিধি-নিষেধ, অনুশাসন ক্রমে-ক্রমে শিশু নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। অর্থাৎ পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা ক্রমশঃ তার নিজের নিষেধাজ্ঞাও হয়ে ওঠে। সুতরাং পিতাকে হত্যা ও মাকে ভোগ করার ইচ্ছাত্যাগ শুধু মাত্র বহির্জগতের দাবী থাকে না—তার অন্তর্জ্জগতেরও দাবী হয়ে পড়ে। এই অন্তঃস্থিত বিবেককে ফ্রয়েড অধিশাস্তা বা Super-ago আখ্যা প্রদান করেছেন। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সঙ্গে অধিশাস্তার গঠনের শুরু হলেও, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার

সমাধানের সঙ্গেই তা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি কার্যকরী থাকে এবং বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর অধিশাস্তা গঠিত হয়। পরবর্তী কালের বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, অধিশাস্তার মূল গঠন পরিবর্ত্তিতও করে দিতে পারে। অধিশাস্তার গঠন ব্যক্তির মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সামাজিক দিক দিয়েও এর গুরুত্ব কম নয়। অন্তঃস্থিত এই অধিশাস্তাই আমাদের সামাজিক নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে— যা সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য। মানসিক দিক দিয়ে, এই অধিশাস্তা অহমের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। প্রবৃত্তিগুলির কোন্‌টি অহম চরিতার্থ করবে, কোন্‌টি করবে না—তা এই অধিশাস্তাই নির্দ্ধারিত করে। প্রবৃত্তিগুলির সংজ্ঞান-মনে প্রবেশের ও ইচ্ছাপূর্ত্তির ক্ষেত্রে অধিশাস্তাই তাদের যাথার্থ্য বিবেচনা করে এবং অধিশাস্তার 'আদেশ-বিরুদ্ধ' ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য আমাদের মনে অপরাধ-বোধ ও শাস্তি পাওয়ার ইচ্ছাও সৃষ্টি হয়। সুতরাং ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সঙ্গে অধিশাস্তা গঠনের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ বলে ফ্রয়েড্ মনে করেন।

অধিশাস্তা কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিথিল, কারুর কারুর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আবার কারুর-কারুর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কঠোর ও শাস্তিমূলক হয়। সাধারণভাবে হয়ত এ পার্থক্যের কারণস্বরূপ বলা যায় যে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা যে মাত্রায় হবে, শিশুর অধিশাস্তার কঠোরতাও সেই মাত্রায় হবে কেন না অধিশাস্তার গঠনই হচ্ছে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞাকে অন্তঃক্ষেপিত (introject) করে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতার সঙ্গে অধিশাস্তার কঠোরতার যোগাযোগ নেই। অধিশাস্তা, হয় অনেক বেশী কঠোর, অথবা অনেক বেশী শিথিল। এর উত্তরে কি আমরা একথা বলতে পারি যে বাস্তব নিষেধের কঠোরতার উপর অধিশাস্তার কঠোরতা নির্ভর করে না, করে কঠোরতার বিষয়ীগত (subjective) মূল্যায়নের উপর। — অর্থাৎ শিশু পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তির কঠোরতাকে যতটা কঠিন বা অকঠিন ভাবে, তার উপর। এর উত্তরে একথাও বলা হয়েছে যে শিশুর নিজস্ব ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলির মাত্রা ও গভীরতার উপর অধিশাস্তার কঠোরতা নির্ভর করছে। অর্থাৎ শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির কঠোরতা যদি অনেক বেশী হয়, তাহলে সে যখন পিতা-মাতার সঙ্গে একাত্মীকরণ করছে তখন ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক শক্তি ছিল, তা নবনির্মিত অধিশাস্তার দখলে চলে আসছে এবং অধিশাস্তা সেই শক্তিবলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অধিশাস্তার কঠোরতা এবং শিথিলতাও বহু মানসিক রোগের কার্যণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরুষ-শিশু পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ (identification) করে তার ঈডিপাস-জটিলতার সমাধান করে। (মনে রাখতে হবে, এই সকল পন্থা

শিশু সচেতন ভাবে গ্রহণ করে না।) এই ক্ষেত্রে, আরও বহু উপাদান কার্যশীল থাকতে পারে। আমরা সকলেই উভয়কামী (bisexual)। এই উভয়কামিতার পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা জন্মজাত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে। সুতরাং যদি কোন পুরুষ-শিশুর মধ্যে স্ত্রী-সুলভ মনোভাব অধিক পরিমাণে থাকে, তাহলে মাকে পিতার মত ভালবাসবার আকাঙ্খার পরিবর্ত্তে সে পিতার কাছে মেয়ের মত ভালবাসা কামনা করতে পারে। এই প্রবণতা পরবর্ত্তী কালে তার স্বাভাবিক যৌন-বস্তু নির্ব্বাচন ও ভোগে বাধা দান করতে পারে। সমকামিতার (homosexuality) অনেকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত এই ভুল একাত্মীকরণ কাজ করে। পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ ও মায়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা আবার আনুষঙ্গিক বহু উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যদি কোন শিশু মাতৃহারা হয় এবং পিতা যদি বাবা-মা উভয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে লালন-পালন করে থাকেন, তাহলে পিতার প্রতি তার আসক্তি প্রবলতর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ের প্রতি তার ভোগ-লিপ্সা, মাতৃস্থানীয়া আয়া, নার্স, বা পিসি, মাসী ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি চালিত হবে। মা যদি স্নেহপ্রবণ না হন, যদি কর্কশ, রূঢ় বা কটুভাষিনী হন, তাহলে সেই মাকে কেন্দ্র করে শিশুর আসঙ্গ-লিপ্সা নাও জাগরিত হতে পারে। আবার পিতার মৃত্যু বা দীর্ঘকাল পিতার অনুপস্থিতি,পিতার ব্যবহার ইত্যাদিও পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক পরিণতি ঠিক কোন দিকে যাবে, তা আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক বহু উপাদান ও শিশুর জন্মগত মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

এতক্ষণ আমরা পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস্-গূঢ়ৈষার জটিলতার আলোচনা করেছি। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ঈডিপাস্-গূঢ়ৈষার আকার, প্রকার, গতি-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত জটিলতর ও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধান ও অভিযোজনই তার তথাকথিত "রহস্যময়" ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম। আমরা নিম্নে ফ্রয়েডের মত আলোচনা করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুর প্রথম ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন তার মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া। ঈডিপাস-স্তরের আগমনের সঙ্গে পুরুষ-শিশুর ভালবাসার পাত্র অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু নারী-শিশুর ভালবাসার পাত্র পরিবর্ত্তিত হয়। যৌন-ক্ষেত্রেও নারী-শিশুকে শৈশ্নিক হস্তমৈথুনের স্থানে vaginal pleasure এ আসতে হয়। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ভালোবাসার পাত্র পরিবর্ত্তন তার মনোজগতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্-ঈডিপাস স্তরে নারী-শিশু পুরুষ-শিশুর মতই মায়ের প্রতি অনুরক্ত। তার হস্তমৈথুন কালেও মায়ের প্রতিরূপকে কেন্দ্র করেই তার চাহিদার পূরণ ঘটে।

অবশ্য এ সময় নারী-শিশু মাকে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকারিণী রূপেই কল্পনা করে (Phallic mother)। শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তি বহু কারণে পরিবর্তিত হতে পারে—যেমন, মা তাকে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ দেন না অথবা নতুন শিশুর আগমনের পরে মা তাকে পূর্বের ন্যায় আদর-যত্ন বা ভালবাসা দেন না। কিন্তু এই সকল পরিস্থিতি পুরুষ ও নারী উভয় শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে। এতদ্‌সত্ত্বেও পুরুষ-শিশুর তার মায়ের প্রতি আকর্ষণ বজায় থাকে কিন্তু নারী-শিশুর ভালবাসার পাত্র পরিবর্তিত হয়। ফ্রয়েড বলেন, এমন একটি কারণ আমাদের সন্ধান করতে হবে, যা কেবলমাত্র নারী-শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে এবং যার গভীরতা ও গুরুত্ব নারী-শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তাঁর মতে, এই কারণটি উপস্থচ্ছেদ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারী-শিশু পুরুষ শিশুর লিঙ্গের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অনুভব করতে পারে এবং নিজের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে সকল অসুবিধাসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে তাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধি নারী-শিশুর নিকটে প্রবলরূপে নৈরাশ্যজনক। প্রথমে সে এটিকে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেই ধরে নেয় কিন্তু ক্রমশঃ সে এর জাতিগত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। সে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকারিনী নয়, এই অনুভূতি তার মনে এক প্রবল ঈর্ষা-বোধের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন—Penis-envy. নিজের এই প্রবল ক্ষতির জন্য নারী-শিশু সম্পূর্ণরূপে তার মাকে দায়ী করে। ফ্রয়েডের ভাষায় "It was a surprise, however, to discover from analysis that the girl holds her mother responsible for lack of a penis & never forgives her for that deficiency." এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারই নারী-শিশুকে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত করে। মাকে নিজের শারীরিক হীনতার জন্য দায়ী করার পর, স্বভাবতঃই নারী-শিশু পিতার প্রতি আকর্ষিত হয়। সুতরাং প্রাক্-ঈডিপাস দশায় মায়ের প্রতি তার যে আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিল, তা এখন পিতার প্রতি ধাবিত হয়। ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ঈডিপাস-দশা দু'টি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। প্রথমটি হল, পিতার প্রতি আসক্তি এবং মাতার প্রতি বিরূপ মনোভাব—এই মানসিক অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া ; দ্বিতীয়টি হল—নারী-শিশু যেন নিজের এই শারীরিক হীনতাকে অস্বীকার করে এবং পূর্বের ন্যায় আচরণ বজায় রাখে। অর্থাৎ পিতাকে ভালবাসার বস্তুরূপে স্বীকার না করে, নিজের পূর্বাবস্থাকেই (Phallic motherএর প্রতি আসক্তি) মেনে চলে। এই মনোভাবই পরবর্তী জীবনে Masculinity-complex এর জনক।

আমরা দেখেছি, পুরুষ-শিশু তার ঈডিপাস-আসক্তি ত্যাগ করে উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কায়। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে, ঘটনাক্রম বিপরীত। নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তর আরম্ভ হয় নিজের উপস্থচ্ছেদের আবিষ্কারের পর। ফ্রয়েডের ভাষায়, "The castration com-

plex prepares the way, instead of destroying it ; under the influence of penis-envy, the girl is driven from her attachment to her mother and enters the Œdipus situation as though it were a heaven of refuge." এই কারণে নারী-শিশু তার ঈডিপাস-অবস্থার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি কখনই পেতে পারে না। কেননা, পুরুষ-শিশুর উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কার মত প্রবল কোন ভীতি তার ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকে না। বরং পিতার নিকট হতে পুরুষ-লিঙ্গসম্পন্ন সন্তান-লাভের মাধ্যমে নিজের শারীরিক হীনতা দূর করার ইচ্ছায়, পিতার প্রতি তার আকর্ষণ দীর্ঘদিন বজায় থাকে। অনেক পরে, নারী-শিশু পিতার প্রতি তার এই আসক্তি অসম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারে। পরবর্ত্তী জীবনে, পুরুষ-সন্তান লাভের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের হীনতা-বোধ দূরীভূত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণে পুরুষ-শিশুর জন্মে মায়ের আনন্দ এতটা প্রবল হয়। ফ্রয়েড বলেন, এই সকল ঘটনা নারী শিশুর অধিশাস্তার গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। নারী-শিশুর অধিশাস্তা, পুরুষ-শিশুর অধিশাস্তার ন্যায় কঠোর ও স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন কখনই হয় না। নারী চরিত্রে ঈর্ষার প্রাধান্যও একটু অধিক। নিজের দৈহিক আকর্ষণের উপর তারা যে গুরুত্ব আরোপ করে, তার মুলও তাদের এই প্রাথমিক হীনতা-বোধের মধ্যে নিহিত। নারীদের মধ্যে স্বকামের মাত্রাধিক্য থাকায়, ভালবাসা দেওয়া অপেক্ষা ভালবাসা পাওয়ার দিকে তাদের আগ্রহ অধিকতর।

যেখানে নারী-শিশু সহজ ভাবে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হতে পারে না, সেখানে এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। নারী-শিশু নিজের হীনতা অস্বীকার করে, পূর্বের আচরণ বজায় রাখে এবং সাধারণ নারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরিণত বয়সে, এরা অনেকেই বিবাহ করেন না এবং নানান্ বৌদ্ধিক ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন। অনেকে সমকামিতার দিকেও আকর্ষিত হন। ফ্রয়েডের মতে, এর পশ্চাতে কোন জন্মগত উপাদান কার্যকরী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

নারী-শিশুর মনোজগতের এই সকল বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য তথ্য ফ্রয়েড ও কয়েকজন বিখ্যাত মনঃসমীক্ষিকা তাঁদের রোগিনীদের সমীক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত হন। অতএব, অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে যে এ ধরণের মানসিক বিবর্ত্তন ঘটে, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু সাধারণ-ভাবে দেখতে গেলে ফ্রয়েড নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হওয়ার যে ঘটনাক্রম বর্ণনা করেছেন তা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। প্রথমে ধরা যাক্ নারী-শিশুর নিজের লৈঙ্গিক হীনতার আবিষ্কার। ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশু পুরুষ-লিঙ্গের সঙ্গে নিজ-লিঙ্গের পার্থক্য অনুধাবনের ফলে হস্তমৈথুনকালে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকতর সুখ প্রদানের ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় নিজেকে হীন মনে করে। কিন্তু তথ্যগত ভাবে কি সকল ক্ষেত্রে এটি সত্য? জীব মাত্রেরই কতকগুলি যৌন সুখ-স্থান (erotic zones) আছে।

নারী-শিশুর ক্ষেত্রে clitoris একটি অনুরূপ তীব্র সংবেদনার স্থান। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে, নারী ও পুরুষ-শিশু স্ব-স্ব দৈহিক গঠন অনুসারে সুখ লাভে সক্ষম এবং সুখ লাভও করে। যদি সুখ লাভে কোন বাধা না থাকে, তাহলে অকারণে লৈঙ্গিক-ঈর্ষা কেন জাগবে? কোন বস্তুরই মূল্য বস্তুর জন্য নির্দ্ধারিত হয় না; হয় সেই বস্তুর আমাদের সুখ প্রদানের ক্ষমতার মাধ্যমে। ফ্রয়েডের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হলে, আমাদের একথা মানতে হয় যে নারী-শিশু পুরুষ-শিশুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে, পুরুষ-শিশুর সুখকে অধিকতর কাম্য বলে অনুভব করে ও সেই কারণে নিজের অভাব-বোধের জন্য নিজেকে হীন মনে করে। প্রথমতঃ এর মধ্যে একটা তুলনামূলক মূল্যায়ন রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ নিজের যৌনসুখকে হীন মনে করার বোধ রয়েছে। এই দু'টির কোনটিই সব ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। কোন একটা সুখকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেই সে সুখের সঙ্গে অন্য সুখের তুলনা করা যায়। যে সুখ নারী-শিশু ভোগ করেনি, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সে এতটা নিশ্চিত কি করে হল যে তার জন্য নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রকে ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে নি? বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ না করলেও, একাত্মীকরণের মাধ্যমে সে সুখ সে ভোগ করেছে। কিন্তু ভোগ করলেই কি নিজের সুখকে হীন বলে মনে হবে? এই বিচার তখনই আসতে পারে যখন পুরুষ-লিঙ্গের দ্বারা প্রাপ্ত সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। নইলে, দু'টো সুখ দু'টো বিশেষ ধরণের সুখ মাত্র। একথা অবশ্য বলা যায়, শিশু কোন্ সুখকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে, তা নির্ভর করছে, তার চাহিদার উপর। যে নারী-শিশু পুরুষ-লিঙ্গের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুখকে অধিকতর সুখকর বলে মনে করে এবং অনুরূপটি কামনা করে, তার ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক-ঈর্ষা এবং হীনতা-বোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু যে নারী-শিশু নিজের সুখটা কাম্য বলে মনে করে, তার ক্ষেত্রে এই ঈর্ষা-বোধ নাও জন্মাতে পারে। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পুরুষ অপেক্ষা হীন মনে করতে পারে কিন্তু তার কারণ তাদের লৈঙ্গিক হীনতা-বোধের মধ্যে নাও নিহিত থাকতে পারে। পৃথিবীতে সভ্যতা নির্বি-শেষে সকল সমাজেই পুরুষরা অধিকতর সুখ, সুবিধা ও মূল্য পেয়ে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুলো অপেক্ষাকৃত কম। জন্ম থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে অন্ততঃ সুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্বিশেষে নারীদের পুরুষ অপেক্ষা নিম্ন স্থানই দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এই হীনতা-বোধ কতটা তার শারীরিক হীনতা-বোধ থেকে উৎপন্ন, এবং কতটা সামাজিক ব্যবহার-বৈষম্যের পুঞ্জীভূত ফল, সেটা সম্ভবতঃ বিচারের দাবী রাখে। বহির্জ্জগতের মূল্যায়নের ঊর্দ্ধে উঠতে পারার জন্য ক্ষমতাশালী, সবল ও পরিণত অহমের প্রয়োজন। শিশুর ক্ষেত্রে অহম্ অপরিণত ও দুর্বল। তাছাড়া, সমস্ত হীনতা-বোধের ধারণাটিই সমাজ উদ্ভূত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারীর শরীরে যৌনসুখের স্থান বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষ অপেক্ষা নারীর যৌন-সুখ-বোধের বৈচিত্র্য ও বিস্তার অনেক বেশী, এ কথা প্রায় স্বীকৃত সত্য। দৈহিক শক্তিতে অবশ্য নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন এবং জীবনের বহু ক্ষেত্রে, বহু অবস্থায় পুরুষের উপর নির্ভরশীল। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারী তা উপলব্ধি করতে পারে। যদি এই অবস্থা সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে, নারী এই তথাকথিত নীচু অবস্থা অথবা পুরুষের প্রতি তার নির্ভরশীলতা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং নিজেই পুরুষ হয়ে উঠ্‌তে চায়—সে ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বে বিকৃতি দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহের মতে, ঈডিপাস-অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার্য নয়—বিশেষ করে নারী-শিশুর ক্ষেত্রে. তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ-সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি এক বিকল্প সমাধান উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ঈডিপাস-অবস্থার মুল দু'টি বৈশিষ্ট হল—(১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আসক্তি এবং (২) প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রোশ। অতি শৈশবাবস্থা থেকেই শিশুর মাতা কিংবা মাতৃ-স্থানীয়ার প্রতি আসক্তি এবং সেই আসক্তির পথে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রোশ লক্ষ্য করা যায়। Sibling rivalry অথবা ভাই-বোনেদের প্রতি ঈর্ষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের বহু পুর্বেই এই ঈর্ষার প্রকাশ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ঈডিপাস-অবস্থায় পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের প্রতি যে ঈর্ষা তার সঙ্গে এই ঈর্ষার গুণগত কোন প্রভেদ নেই। ডঃ সিংহের ভাষায়, I have not been able to trace any such distinctive feature between the two as yet. Only some differences that are noticeable are found in the area of forms of ideas connected with the sentiments & emotions of love & hate etc. and their expressions in the later phase." অর্থাৎ প্রাক্-ঈডিপাস স্তরের আক্রমমুলক মনোবৃত্তির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। পার্থক্যটি শুধু মানসিক contents এর ক্ষেত্রে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে তার বৃত্তি, প্রবণতা ও ব্যবহারের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সুচিত হতে থাকে। অতি শৈশব থেকেই শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও অল্প-সল্প সামাজিক শিক্ষাও দেওয়া হতে থাকে। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের বহুপূর্ব থেকেই শিশুর মনে শাস্তি সম্পর্কে ভীতি দেখা দিতে ও প্রকাশ পেতে পারে। "fear or threat of punishment is understood from fairly early days of life. It is not possible to indicate any strict age limit for such understanding...... Handling & tickling of the sex-organ are first restricted & then thre-

atened with punishment......Are we justified, then, to hold that the castration threat modifies the Œdipus wishes of a child ?" অবশ্য এ কথা স্মর্তব্য যে ডঃ সিংহের "উপস্থচ্ছেদ-ভীতির" ধারণা ফ্রয়েডের ধারণা থেকে কিছুটা পৃথক। ডঃ সিংহের মতে—Separation from, denial of or missing anything considered valuable may he felt as a loss." এবং এই ধরণের যে কোন প্রবল ক্ষতির আশঙ্কা নির্জ্ঞান-মনে উপস্থচ্ছেদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, অধিশাস্তার গঠন, যা ফ্রয়েডের মতে উপস্থচ্ছেদ-ভীতির প্রত্যক্ষ ফল, সম্পূর্ণরূপে উপস্থছেদ-ভীতির উপর নির্ভর করে না। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে পিতা-মাতার নিকট হতে রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশাস্তা অনুরূপ কঠোর নয়, আবার স্নেহপূর্ণ, কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশাস্তা অতিশয় কঠোর। ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, উপস্থছেদের-ভীতির কারণ হচ্ছে অবদমিত উপস্থচ্ছেদ-ইচ্ছা। এই উপস্থচ্ছেদ-ইচ্ছা শিশুর নিষ্ক্রিয়তা বা passivityর ইচ্ছা—যা অতি শৈশব-কাল থেকে অবদমিত হয়ে আসছে। "Castration threat, therefore, cannot be accepted as a product of Œdipus-complex. All that can be said is that gradually the threat of punishment gains wider range with the growth & development of the child which gets a further fillip in the Œdipus-stage." নারী-শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস-স্তরের আগমনের যে বর্ণনা ফ্রয়েড দিয়েছেন, ডঃ সিংহের মতে, মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সব সময় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। লৈঙ্গিক-ঈর্ষা অনেক মেয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, "but in actual analysis it is not found to be sufficiently strong to effect the change in shifting the choice of the object of love from her mother to her father as suggested by Freud. তাঁর মতে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ইত্যাদি বহুলাংশে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বা প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রবণতার স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন বহু পরিবার রয়েছে যেখানে অতি অল্প বয়স থেকে মা ও মেয়ে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। মনঃসমীক্ষণ কালে অবশ্য প্রায় প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে উভয়বলতা (ambivalence) এর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য যে পিতা-পুত্র ও মা-মেয়ের সম্পর্কের বিরোধিতাকে সাধারণ নিয়মরূপে মেনে নিতে হবে—তা সমর্থন-যোগ্য নয়। সন্তানদের মধ্যে পিতার কন্যার প্রতি এবং মায়ের পুত্রের প্রতি আসক্তি বহুলাংশে আমাদের জৈবিক-প্রবণতার (biological tendency) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে তিনি মনে করেন। কোন শিশুই পিতা কিংবা মাতার প্রতি আকর্ষিত হবে না যদি পিতা-মাতা তার প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার প্রদর্শন না করেন অথবা অতিশয় কঠোর, শাস্তিপ্রবণ

ও নির্দয় হন। শিশুর প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে তার প্রয়োজনের তৃপ্তি। যেহেতু মা বা মাতৃস্থানীয়া তার সেই প্রয়োজনগুলি মেটান, সুতরাং শিশুর প্রথম আকর্ষণ মায়ের প্রতি। ক্রমশঃ শিশুর চাহিদার সঙ্গে মানসিক চাহিদা, যথা প্রশংসা পাবার ইচ্ছা, মূল্য পাবার ইচ্ছা, স্নেহ, ভালবাসা পাবার ইচ্ছাও যুক্ত হতে থাকে। এই চাহিদার কেন্দ্র প্রথমে তার পিতা-মাতাই হন। শিশুর এই সকল চাহিদা যদি পিতা-মাতার নিকট হতে তৃপ্তি লাভ না করে অথবা যদি বিপরীত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্যবহারকারীর প্রতি শিশুর আকর্ষণ বজায় থাকে না, অথবা শিশু তার প্রতি আকর্ষিত হয় না। নিজেদের জৈবিক-প্রবণতা অনুসারে পিতারা কন্যার প্রতি এবং মাতারা পুত্রের প্রতি অধিকতর স্নেহ-ভালবাসা অনুভব ও প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং শিশু যেহেতু বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার নিকট হতে অধিক পরিমাণে মূল্য ও স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে থাকে, সেহেতু ঈডিপাস-স্তরে তার ইচ্ছাগুলি বিপরীত জনয়িতার প্রতি ধাবিত হয়।

ডঃ সিংহের মতে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার নির্দ্ধারণে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কার্যকরী—তা হচ্ছে আমাদের উভয়কাম-প্রবণতা বা bisexuality. প্রতি পুরুষের মধ্যে নারীত্ব ও নারীর মধ্যে পুরুষত্বের শারীরিক ও মানসিক উপাদান রয়েছে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে এই দুই বিপরীত মানসিকতার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে। যৌন-সুখও পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করা তখনই সম্ভব, যখন নারী ও পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরস্পরের সুখ-ভোগে সক্ষম হবেন। আমাদের এই উভয়কামিতার জন্য বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাত্মীকরণ সহজতর হয়। কারণ বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে আমাদের উভয়কামিতার বিপরীত অংশটি তৃপ্ত হয়—অর্থাৎ পুত্রের সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে মায়ের মধ্যে যে পুরুষত্ব (Masculinity & Activity) রয়েছে তা তৃপ্ত হয় এবং পিতার ক্ষেত্রে কন্যার সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে তার নারীত্ব (femininity ও passive desires) তৃপ্ত হয়। সুতরাং পিতা-মাতা বিপরীত লিঙ্গের শিশুর প্রতি অধিকতর ও গভীরতর স্নেহ অনুভব করেন এবং এই স্নেহের প্রদর্শনের ফলে শিশুও বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আকর্ষিত হয়। ডঃ সিংহের ভাষায়, "The child of the opposite sex thus acts as a pleasant stimulus for whom the parent feels greater attachment. The child also learns to respond to this special attachment in the process of which the child also finds greater pleasure by identification with the parent of the opposite sex for the same reason."

অতএব, দেখা যাচ্ছে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার কারণ সম্পর্কে এই দুই মনঃসমীক্ষক এক মত নন, যদিও তার অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে দু'জনেই একমত। দু'জনের বর্ণনাই

মনঃসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর। সম্ভবতঃ লিবিডোর বিবর্ত্তনের এই স্তর সম্পর্কে আরও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। জৈবিক-প্রবণতাকে ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার কারণ বা একটি কারণরূপে স্বীকার করা, ফ্রয়েডের মতে, প্রশ্নটির অতিশয় সরলীকরণ। অপরদিকে, তিনি নিজে যে জটিল তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তার সম্পূর্ণ সমর্থনও পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতের গভীরতর অনুসন্ধান হয়ত আমাদের এ বিষয়ে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দানে সাহায্য করবে।

ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার বহু উদাহরণ বিভিন্ন দেশের রূপকথা, পুরাণের কথা, কাব্য-সাহিত্য ও বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত যে সকল নৃতাত্ত্বিক (anthropological) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যেক সভ্যতায় কোন না কোন রূপে ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ফ্রয়েড তাঁর "Totem and Taboo" গ্রন্থে বিভিন্ন আদিম জাতির Totem এর প্রতি আপাতবিরোধী ও অব্যাখ্যাত ব্যবহারগুলিকে তাঁর ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার মাধ্যমে এক সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, Totem হচ্ছে সাধারণভাবে পিতার প্রতীক। যে জাতির যে Totem, তাদের সেই Totem (totem সাধারণতঃ কোন বিশেষ জাতির জন্তু হয়) মারা নিষিদ্ধ এবং যে যে জাতির সেই এক totem তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই প্রথার মুল কারণ পিতার প্রতি শিশুর যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি তাকে সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে বাধা দান করা। দ্বিতীয় প্রথার মাধ্যমে incest বা সেই একই দলের লোকেদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে এই বাধাগুলির মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রবৃত্তিগুলি মানব-মনে ক্রিয়াশীল। তাঁর নিজের ভাষায়—"The law only forbids men to do what their instincts incline them to do, what nature itself forbids & prohibits, it will be superfluous for the law to prohibit & punish.........instead of assuming, therefore, from the legal prohibition of incest, that there is a natural aversion to incest, we ought rather to assume that there is a natural instinct in favour of it & that if law represses it, it does so, because civilized men have come to the conclusion that the satisfaction of these natural instincts is detrimental to the general interests of society."

বিশেষ বিশেষ উৎসবে totemকে হত্যা করা, তারপরে শোক পালনকরা ও শেষে আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথাটিও ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার আলোকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নির্জ্ঞান-মনে অবদমিত পিতার প্রতি ক্রোধ ও রাগ সামাজিকভাবে বিশেষ বিশেষ দিনে

Totemকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ক্রোধ-প্রকাশের পর, পিতার প্রতি ভালো লাগা বা ভালবাসার ইচ্ছাগুলি প্রবল হয়ে ওঠে—তাই শোকপালন। অবশেষে, ইচ্ছাপূরণের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজেও নানান্ প্রথার মাধ্যমে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার ইঙ্গিত মেলে, যেমন, কন্যাকে মা ও পুত্রকে বাবা বলে সম্বোধন করা। উত্তর প্রদেশের এক বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম পুত্রের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—তাতে নাকি তার আয়ুক্ষয় হয়। (স্বামীর নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—পুত্রের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—একই কারণ। নির্জ্ঞান-মনে স্বামী পিতার প্রতীক।) ঐ একই প্রদেশে এক প্রচলিত বিশ্বাস যে মায়ের শরীরের দৈর্ঘ ছেলের কাঁধ পর্যন্ত হওয়াটা শুভ। এইগুলির পশ্চাতে ঈডিপাস-প্রবণতার উঁকি-ঝুঁকি ধরতে পারা কঠিন নয়। এছাড়া নানান্ পুজো-পার্বন, ব্রতকথা ইত্যাদির মাধ্যমে এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করার সম্ভাবনা বর্তমান।

যৌন-বস্তু নির্বাচনে অবদমিত ঈডিপাস-কামনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণভাবে, পুরুষরা তাঁদের স্ত্রীর মধ্যে এক মাতৃরূপও সন্ধান করেন এবং নারীরা তাঁদের স্বামীর মধ্যে পিতার ভাবরূপের সন্ধান করেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চাহিদা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মনে তাঁর মায়ের ভাবরূপের নিকট তাঁর চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বহু পুরুষের দাবী থাকে, স্ত্রী তাঁকে দেখবে, সেবা-শুশ্রূষা করবে, যত্ন করবে, সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখবে ইত্যাদি। অবশ্য তার সঙ্গে বয়স্কজনোচিত অন্যান্য চাহিদাও যুক্ত থাকে। স্ত্রীর প্রতি মাতৃসুলভ চাহিদা কতটা হবে—সেটা নির্ভর করে তাঁর শৈশব ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধানের উপর। শিশু যদি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মায়ের প্রতি তার আকর্ষণের স্বরূপ অনুধাবন করে, সেই গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ বয়স্ক পুরুষের সুখভোগে সক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রীর নিকট তার মাতৃসুলভ চাহিদার পরিমাণ কম হবে। আর যদি বয়োবৃদ্ধির পরও ঐ চাহিদাই প্রধান হয়ে মানসিক চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে থাকে তাহলে অবস্থা ভীতিকর হয়ে ওঠে কেননা তাহলে স্ত্রীদের চাহিদা-তৃপ্তির উপায় হারিয়ে যায়।

সংকলন :—

শিশুর ক্রমবিকাশ

দীপালি বসু

. প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ ধরে একটি জীব-কোষ মাতৃজঠরে থেকে মাতৃ-দেহরস আহরণ করে একটি শিশুতে পরিণত হয়। সদ্যজাত শিশু একটি অসহায় জীব। কান্না এবং তারপর চোষার ক্ষমতার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের সাথে মোকাবিলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে থাকে ও নানা ক্ষমতার অভিব্যক্তি হয়। দেহে ও মনে একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর বিকাশ ধাপে-ধাপে কিভাবে ঘটে তা মনোবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে শিশুর পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশ ধারার উপরই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের রূপ ও মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এই কারণেই স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুর বিকাশধারা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার। নিচে এই বিকাশধারার একটি তালিকা দেওয়া হলো। এটি মনোরোগ-চিকিৎসক Stella Chess লিখিত একটি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত স্বাভাবিক শিশুর আচরণের তালিকার (Land marks of Normal Behaviour Development) সংক্ষিপ্তসার। প্রবন্ধটি 'Comprehensive Text Book of Psychiatry (Editors-Freeman & Kaplan ; 1967) নামক পুস্তকে প্রকাশিত।

৪ সপ্তাহের নিচে বয়স :—

চিত হয়ে শুয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে পারে। উপুড় করে রাখলে মাথা এদিক ওদিক নাড়াতে পারে। ঝুমঝুমি বা অনুরূপ কিছুর শব্দে সাড়া দেয়। ক্ষণিকের জন্য আশে-পাশের লোকজন বা বস্তুসামগ্রীর নড়াচড়া লক্ষ্য করতে পারে। গলা দিয়ে অল্প-অল্প বৈশিষ্ট্যহীন আওয়াজ বের করে। কাঁদলে কোলে তুলে নিলে চুপ করে।

৪ সপ্তাহ বয়স :—

হাত মুঠি করতে পারে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাথা সোজা করে রাখতে পারে। চলমান কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি নজর রাখতে পারে। গ্‌—গ্‌—গ্‌ ইত্যাদি ধ্বনি

করে। কাছে কেউ এসে দাঁড়ালে বা ঝুঁকে পড়লে চুপ করে। কেউ কথা বললে লক্ষ্য করে।

১৬ সপ্তাহ বয়স :—

ঘাড় শক্ত হয়। মাথা সোজা করে রাখতে পারে। উপুড় করে দিলে মাথা ৯০° ডিগ্রী অনুরূপ উঁচু করে তুলতে পারে। সামনে কোন জিনিষ আস্তে আস্তে নড়া-চড়া করলে তার প্রতি ভালোভাবেই নজর রাখতে পারে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে ঝুমঝুমি জাতীয় কোন জিনিস ঝুলিয়ে দিলে হাত দিয়ে তা ধরবার চেষ্টা করে। খিলখিল্ করে হাসতে পারে। কিছু সময় ধরে উ—উ—উ—, আ—আ—আ— ইত্যাদি ধ্বনি করতে পারে। অন্য কারুর হাসিতে সাড়া দিতে পারে। অপরিচিত পরিস্থিতি ও পরিবেশ বুঝতে পারে।

২৮ সপ্তাহ বয়স :—

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতের উপর ভর রেখে বসতে পারে। দাঁড় করিয়ে ধরে রাখলে লাফাতে শুরু করে। হাত বাড়িয়ে খেলনা ধরে। ঝুমঝুমি ধরে ঝাঁকাতে চেষ্টা করে। কাঁদবার সময় ম্—ম্—ম্ ধ্বনি করে। বিভিন্ন স্বরবর্ণমূলক ধ্বনিও করতে পারে। পায়ের বুড়ো আঙুল মুখে দেয়। মুখের সামনে আয়না ধরলে তার উপর চাপড়াতে থাকে।

৪০ সপ্তাহ বয়স :—

একা একা সহজভাবে বসে থাকতে পারে। হামাগুড়ি দেয়। কিছু ধরে নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। আঁকি-বুকি দেবার মত হাতের ভঙ্গী করতে পারে। দ্দা—দ্দা—দ্দা শব্দ করতে পারে। নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়। দুধের বোতল ধরে খেতে পারে। ওর সঙ্গে কেউ খেলা করলে তাতে যোগ দেয়।

৫২ সপ্তাহ বয়স :—

অন্য কারুর হাত ধরে হাটতে পারে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে। কিছু প্রকাশ করার জন্য অর্থহীন শব্দ করে। কেউ চাইলে নিজের খেলনা অন্যকে দেয়। জামা-কাপড় পরাবার সময় সহযোগিতা করে।

১৫ মাস বয়স :—

টলতে টলতে হাটতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৩-৫টা অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের কোন ছবি দেখালে তার উপর চাপড়াতে

থাকে। নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। খেলার ছলে বা অপছন্দ হলে জিনিষ-পত্র ছুঁড়ে মারে।

১৮ মাস বয়স :—

ভালোভাবেই হাটতে পারে। অন্যের হাত ধরে সিঁড়ি উঠতে পারে। বল ছুঁড়ে মারতে পারে। পেন্‌সিল বা চক দিয়ে আঁকি-বুকি দেয়। নিজের নাম বলতে পারে। প্রায় ১০টা অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। ছবিতে পরিচিত জিনিস দেখাতে পারে। খুব সাধারণ নির্দেশ যেমন 'মাকে গ্লাসটা দাও', বা 'টেবিলের উপর বল রাখ' —ইত্যাদি পালন করতে পারে। কিছু-কিছু খাবার ফেলে ছেড়ে নিজে নিজে খেতে পারে। নিজের পুতুল কোলে তুলে নিয়ে আদর করে।

২ বছর বয়স :—

না পড়ে ভালোভাবে দৌড়াতে পারে। বড় বল পা দিয়ে মারে। একা একা সিঁড়ি উঠতে বা নামতে পারে। ট্রেনের অনুকরণে দিয়াশলাইয়ের বাক্স বা ঐ জাতীয় জিনিষ পর পর সাজায়। দেখে দেখে খাড়া বা গোলমত দাগ দিতে পারে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করে বাক্য বলতে পারে। সাধারণ নির্দেশ পালন করে। টেনে জামা খুলতে পারে। ঘর-সংসারের কাজের অনুকরণ করে হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি ইত্যাদি দিয়ে রান্না-বাটি বা পুতুল খেলে। নিজেকে নিজের নাম বলে উল্লেখ করে।

৩ বছর বয়স :—

তিন চাকার সাইকেল চড়তে পারে। নিচের সিঁড়ি থেকে লাফ দেয়। একের পর অন্য পা ব্যবহার করে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৯-১০টা কাঠের টুকরো বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ পর-পর স্তম্ভের মত করে সাজাতে পারে। গোল এবং ক্রশ চিহ্ন অনুকরণ করে আঁকতে পারে। নিজে ছেলে না মেয়ে তা বলতে পারে। বহুবচন ব্যবহার করে। বইয়ের পরিচিত ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারে। নিজে নিজে জুতো পরে। জামার বোতাম খুলতে পারে। ভালোভাবে নিজের হাতে খেতে পারে।

৪ বছর বয়স :—

এক পদক্ষেপে এক সিঁড়ি নামতে পারে। এক পায়ে ৪ থেকে ৮ সেকেণ্ড দাঁড়ায়। চার সংখ্যা পর্যন্ত কেউ বললে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তিনটি জিনিষ দেখিয়ে দেখিয়ে গুনতে পারে। রংয়ের নাম ঠিকমত বলতে পারে। 'উপরে', 'নীচে', 'মধ্যে',

'সামনে', 'পিছনে' এবং 'পাশে' —এগুলি বুঝতে পারে। নিজে নিজে দাঁত মাজতে মুখ ধুতে ও মুছতে পারে। অপর শিশুদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা করে।

৫ বছর বয়স :—

একের পর অন্য পা দিয়ে লাফাতে পারে। পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয়। চতুষ্কোন আঁকতে পারে। দেখে বোঝা যায় এমনভাবে মাথা, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ মানুষের ছবি আঁকতে পারে। ১০টা জিনিষ নির্ভুলভাবে গুনতে পারে। প্রচলিত মুদ্রা চিনতে পারে। বুঝতে না পারলে· শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। জামা, প্যান্ট ইত্যাদি নিজে নিজে পড়তে ও খুলতে পারে। কিছু কিছু বর্ণ লিখতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা করতে পারে।

একটি নব প্রক্ষোভবাদ সম্বন্ধে অভিভাবন (৩য়)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় *

(ইং ১৯৩২ সনে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা-বিভাগের সভাপতি ডঃ সুহৃদ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাষণ, —Suggestions for a new Theory of Emotion -এর বাংলা অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫ম খণ্ডে শিশুদের প্রক্ষোভ ও অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে ষ্টার্ণ (Stern) প্রক্ষোভকে ব্যক্তিত্বের একটি প্রলক্ষণ (trait) হিসাবে দেখিয়েছেন। প্রক্ষোভ ও অনুভূতির সম্পর্ক আলোচনায় তিনি বলেছেন—"আধুনিক জীবনের ধারা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মাত্রায় অভিব্যক্ত; অনুভূতির তীক্ষ্ণতাবোধ ছাড়াও অনুভূতি-গুরুত্বেরও মাত্রাবোধ হয়। এমন অনেক অনুভূতির উপলব্ধি হয় যেগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া সত্বেও সেগুলিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সামান্যই দেওয়া হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতির প্রকাশে তীক্ষ্ণতার মাত্রা থাকে খুব কম।" কাৎজ্ (Katz) এই খণ্ডে শিশুদের সঙ্গে বয়স্কদের কথাবার্ত্তার মাধ্যমে শিশুদের বিবেক গঠন সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করেছেন।

৬ষ্ঠ খণ্ডে, নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) এবং ধর্মের সঙ্গে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারি। ল্যাঙ্গফেল্ড্ (Langfeld) এর মতে—"যেখানে একধরণের কোন মানসিক দ্বন্দ্বকে বাস্তব জগতের চিরাচরিত কোন কর্মের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেখানেই সুরু হয়েছে কলাসৃষ্টির আকাঙ্খা।" এই সূত্রে তিনি ফ্রয়েড-এর সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঠিক একই রকম ভাবে নান্দনিক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস আমরা আয়ত্ব করতে পেরেছি। ঝ্যাঞ্চ্ (Jaensch) দেখিয়েছেন, ব্যক্তি বিশেষ যে ধরণের ধর্মীয় আধানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যে আদর্শবোধের

* মনোমিতিবিদ, ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাধ্যমে সেগুলির মূল্যায়ন করেন সেগুলি তিনি যে ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারই ফলস্বরূপ। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) 'আই' (I-) অথবা সম্পূরিত জাতিরূপ (integrated type) এবং (২) 'এস' (S-) বা সহসংবেদন জাতিরূপ (synaesthetic type)। গ্রুহেন (Gruehn)-এর মতে ধর্ম-অনুভূতির মানসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দু'টি কর্ত্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ ধর্মানুভূতির মৌল উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও গঠনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার কর্ত্তব্যটি আমরা সম্পাদন করেছি। "ধর্ম, যাকে আমরা সাধারণতঃ ধর্মানুভূতি বলি সেটি একটি বিশেষ যৌগিক আধান, একটি সংশ্লেষণ (synthesis) বা একটি গেষ্টাল্ট্‌ সেটি দুই গোষ্ঠীর (মানসিকতা ও মতাদর্শ) একান্ত মিলিত প্রকাশ। আবার একই ধারে এটি স্ব-কার্মিক (self-function) এবং একটি মানস-ক্রিয়া (mental operation)"। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে কর্ত্তব্যটিকে আমাদের সামনে রাখতে হবে তা হোল, "বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতিগুলিকে একটি একটি করে সাজানো আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করা।"

৭ম খণ্ডে ব্রেট (Brett) সংক্ষেপে প্রক্ষোভ-তত্ত্বগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ৮ম খণ্ডে টেরী (Terry) শিশুদের আবেগাদি নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার এবং প্রক্ষোভগুলিকে যথাযথ পরিচালন করার বিষয়ে বয়স্কদের কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা জনিত বিপদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পুস্তকটির সবকটি পরিচ্ছেদকে তাড়াতাড়ি আর খানিকটা অপ্রতুল নিরীক্ষণের পর, এই অধিবেশনে পঠিত প্রথম প্রবন্ধটিকে, যেটিকে খানিকটা ইচ্ছা করেই বাদ রেখেছিলাম, সেটিকে এখন স্বস্তিতে আলোচনা করছি। স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় বেণ্টলে (Bentley) এখানে প্রশ্ন তুলেছেন,—আজকের দিনে প্রক্ষোভ কি কেবল পাঠ্য-পুস্তকের একটি শিরোনামা মাত্র না আরও কিছু? প্রসঙ্গটিকে এত দৃপ্তকণ্ঠে বলার মাধ্যমে তিনি বহু অনামী মনোবৈজ্ঞানিক গবেষকের মনোভাবকেই প্রকটিত করেছেন যাঁরা এটার প্রকাশ্য আলোচনায় নানা কারণে ভয় পাচ্ছিলেন। আমি জানি না, এই অধিবেশনের শেষে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন করা বা তাঁর মনোভাবের কোন রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কিনা! তিনি কি বুঝতে পেরে-ছিলেন, মতবাদগুলির বৈপরীত্ত কমে গেছে বা প্রক্ষোভ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধানের কাছে এসে পৌঁছেছে?

সমস্যাগুলি বর্ত্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছতে পারাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি কি না তার চাইতে প্রধান সমস্যাটির পটভূমির একটি প্রশ্ন আমাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বর্ত্তমান দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যায় বলা হ'য়েছে প্রক্ষোভের অনুসন্ধান মাত্র অল্পকাল হোল শুরু হ'য়েছে—তাইজন্য তখনও পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে যথার্থ পদ্ধতি বা নির্দ্দিষ্ট গবেষণা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। আজ আমার জান্‌তে ইচ্ছা করে, এতদিন পর্য্যন্ত মানসজীবনে প্রক্ষোভের অবদানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'লেও যতটা অনুধাবন করা উচিত ছিল তা' না ক'রে, ঐ সম্বন্ধে কী এমন ঘটল যার ফলে ইদানীং কালের বিখ্যাত সব মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়ে হঠাৎ এই ধরণের একটি বিশেষ আলোচনা সভার আহ্বান করতে হোল!

সাধারণতঃ এইধরণের জিজ্ঞাসার যে উত্তরগুলি দেওয়া হ'য়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান হোল—প্রক্ষোভ মানবমনের এমনই এক অদ্ভুত (peculiar) অবস্থা, যাকে অন্যান্যসব মানস-ক্রিয়ার অনুশীলনে প্রযোজ্য প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা করা যায় না। প্রয়োগশালায় একটি যথার্থ আবেগ সৃষ্টি ক'রে সেই মানসিকতার উপর অনুসন্ধান চালানো একরকম অসম্ভবই বটে—সেইজন্যে ইচ্ছা থাক্‌লেও কাজের অভাব দেখা দিয়েছে। আমি মনে করি, এই ধরণের ব্যাখ্যা অর্দ্ধসত্য,—এতে আমার প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব হয়ত কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এমন 'হঠাৎ-উৎসাহের' প্রাবল্যের কারণটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এর জবাবটিকে আমাদের অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

আমার মনে হয়, প্রক্ষোভ সম্বন্ধে জানার এই নূতন প্রচেষ্টার কারণ বোঝা অনেক সহজ হবে যদি আমরা মনে রাখি যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড-এর নির্জ্ঞানতত্ত্ব এই সময়েই আবিষ্কৃত হ'য়েছে। জ্যাষ্ট্রো (Jastrow)'র মতে এই সমসাময়িকতা আকস্মিক নয়; অবশ্য, তিনি এর যে বিরাট গুরুত্ব ও প্রভাব আছে সেটাকে স্বীকার করেন নি। আমার মতে, এটাই একমাত্র ঘটনা যা অনুভূতি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে আরও জানার প্রেরণা এনে দিয়েছে। এককথায় ফ্রয়েড মানুষের মনের ঢাক্‌না খুলে দিয়ে তার মধ্যে যা' লুকিয়ে ছিল সেগুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কারাকক্ষের দরজা খোলামাত্রই যেন বন্দীরা বাইরে এসে প'ড়েছে।

তাই মনে হয় লোকে আজ শক্তিশালী প্রক্ষোভগুলির প্রভাবে মানসচেতনা কিভাবে আলোড়িত হয় তা জানতে পেরেছে আর সেই কারণেই মনস্তাত্ত্বিকরা বেশী করে সেইদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। এই নবস্ফুরিত আবেগ আজ সর্ব্বমনে সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। যখন ফ্রয়েড উদাহরণ ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিমানসকে অবদমন মুক্ত ক'রে নতুন ক'রে প্রতিভাত করলেন তখন থেকেই পার্থিব সব কিছু যেন তাদের অবগুণ্ঠন

ত্যাগ ক'রে আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হোল। এই তত্ত্ব অপেক্ষা আজ পর্য্যন্ত আর কোন যথার্থ অভীক্ষা এবং অভিক্রীয়াযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আমার চোখে পড়েনি। ফ্রয়েড এক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান, যখন তিনি সবেমাত্র অস্বাভাবিক অবদমনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে শুরু ক'রেছেন তখনই বিশ্বের বিদ্বৎসমাজ চিরাচরিত ধারা পাল্টে ফেলে তাঁর মূল প্রতিবেদনগুলির পরীক্ষায় এবং প্রধান মতবাদগুলির সত্যতা নিরূপনে বিরাট এক অভিক্রীয়া শুরু করলেন।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি কারণ আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, প্রক্ষোভকে তার নিজস্ব আঙ্গিকে বুঝবার চেষ্টা না ক'রলে কখনই এর প্রারম্ভিক ও শুদ্ধসত্তা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হবে না। টিচেনার তাঁর মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলেছেন, মানুষ নিজেকে চিন্তাশীল জীব ব'লে গর্ব্ব করে, কিন্তু সারাজীবনে বাস্তবিক সে কতটুকু সময় অতিবাহিত করে তার চিন্তায়! —বস্তুতঃ মানুষ প্রায় সবকিছুকেই প্রায়সময়ই বিনা সমালোচনায় মেনে নেয় আর সংস্কারগুলিকে তো বিনা যুক্তিতেই আত্মস্থ করে। আমার মনে হয়, আবেগের ব্যাপারেও এইধরণের একই মন্তব্য করা যেতে পারে—। মানুষ সারাজীবনে কতটুকু সময় প্রক্ষোভকে অনুভব করতে পারে! অনুভূতিগুলি হোয়ে দাঁড়ায় অভ্যাস আর আবেগগুলি সামাজিকতার কয়েকটি বিশেষ দিক হিসাবে দেখানো হ'য়ে থাকে। সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের দিনে শুদ্ধ প্রক্ষোভের বিভিন্ন প্রকাশ ও প্রকারকে কিভাবে অনুভব করা যাবে? বিভিন্ন বীক্ষনাগারে মনস্তাত্ত্বিকরা প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা' দেখেছেন তা তার কঙ্কালমাত্র—একটি ক্ষুদ্রাংশ। জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের সহায়তায়, মনোবিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রক্ষোভের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানই অর্জ্জন করেছে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত স্নায়ু-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে এবং মানসিক হাসপাতালগুলিতে অস্বভাবী-মন সম্বন্ধে জানা না গেছে ততদিন পর্যন্ত প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নি, আর, গবেষণার আঙ্গিকে তার স্থানও যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নি। প্রক্ষোভ-দ্যোতনার (expressions of emotion) প্রকার ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণায় শারীরবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সাফল্যলাভ ক'রেছেন কিন্তু প্রক্ষোভের সূক্ষ্ম ও বিভিন্নমুখী উদ্গতিগুলি (sublmations) সম্বন্ধে সবেমাত্র আমরা কিছু কিছু জানতে পারছি!

এ পর্য্যন্ত যা বলেছি তা যদি সত্য হয়, তবে এটাও বলা উচিত যে, সামগ্রিক বিচারে 'অনুভূতি ও প্রক্ষোভ' পুস্তকটিতে মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বের স্থান খুব কমই দেওয়া হ'য়েছে। এখানে মনঃসমীক্ষণকে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের রুগ্নাবস্থার সঙ্গে এক ক'রে দেখানো হ'য়েছে

আপাতঃদৃষ্টিতে এইধরণের মনোভাব সমর্থনযোগ্য, কারণ মনঃসমীক্ষকরা সাধারণতঃ মানসিকরোগীদেরই পর্যবেক্ষণ চিকিৎসা ক'রে থাকেন। অধিকাংশ মনঃসমীক্ষকরাই চিকিৎসক, তাই স্বভাবতঃই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরাই তাঁদের কাছে আসেন আর তাঁরা এঁদেরই মানসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের বেশী সুযোগ পান। সেই কারণে তাঁরা যে মনস্তত্ত্বের চিরাচরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারেন নি সেটা তাঁদের অপারগতা নয়। এদিক থেকে বিচার করলে, তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের দায়িত্ব হ'ওয়া উচিত, চিকিৎসকসমাজ যে বিশাল তথ্যগুলির পরিবেশন করছেন সেগুলিকে উপযুক্তভাবে আত্তীকরণ করা এবং মনস্তত্ত্বের পরিধিতে যথাযথ পরিচয়ে সেগুলিকে বিন্যস্ত করা। চোখ বন্ধ ক'রে আর কিছু নেই—এই ধরণের চিন্তা করার অভ্যাস যেমন বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে ক্ষতিকর, তেমনি অষ্ট্রীচ্ পাখীর আত্মহননকারী ব্যবহারের মতই পরিত্যজ্য। আমি জানি না, এই অধিবেশনে ফ্রয়েড, জোন্স, ব্রীল প্রমুখ চিন্তানায়কদের নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল কি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমি অন্য বহু কর্মীর সঙ্গে একমত হ'য়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হ'চ্ছি যে এই ধরণের বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থে একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ বাদ পড়ে গেছে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককভাবে যত সুন্দরই হোক না কেন তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমিতি না থাকলে তা' কখনই সৌন্দর্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। ঠিক এই ঘটনাই এই পুস্তকটির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এখানে প্রতিটি প্রবন্ধই নিজ ভঙ্গীতে সুন্দর, কিন্তু যেটি সেগুলির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারত, তাদের সকলের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনা করতে পারত, বাদ-প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে একটা ঐকাত্মবোধের সূচনা করতে পারত—তারই অভাব এখানে ঘটে গেছে।

সমগ্র পুস্তকটি সম্বন্ধে মোটামুটি এই আলোচনার পর প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্বন্ধে এখন আলাদা করে কিছু বলার চেষ্টা করছি। প্রধানতঃ পুস্তকটির প্রথমাংশের ওপরই আমি বেশী নজর দেব কারণ সেখানেই অনুভূতি ও প্রক্ষোভের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আর একটি কারণ হোল, আমার প্রধান উদ্দেশ্য হোল প্রক্ষোভ বা আবেগের একটি সাধারণ তত্ত্বের আবিষ্কার করা, —কোন নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর আলোচনা করা নয়।

বর্ণনামূলক মনস্তত্ত্বের (Descriptive Psychology) ক্ষেত্রে ক্র্যুগারের প্রবন্ধটি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর চিন্তাশীলতা, যুক্তির সংগতির পরিচয়ে এক অসামান্য নিদর্শন। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলীর বর্ণনায় যথাসম্ভব সত্যতা রক্ষা করার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই তত্ত্বটির মূলকথা হোল, আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা সব সময়েই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াসে এক একটি যৌগিক সামগ্রীকতা

(complex total)। তাঁর মতে অনুভূতিগুলিও এই ধরণের সামগ্রীক অভিজ্ঞতার যৌগিক উপাদানগুলির দ্বারা সৃষ্ট। অভিজ্ঞতাসমূহের গুণগত পরিবর্তনের একটি অনবচ্ছেদক মান আছে, আর তারই ভিত্তিতে অনুভূতিসমূহ একটি থেকে অপরটিতে, এমন কি বিপরীত গুণসম্পন্ন দিকেও পরিবর্তিত হয়। যে অনুভূতিগুলি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ তাদের গুণগত প্রকারভেদের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। এখানে গেষ্টাল্ট্ মতবাদকে অনুসরণ করা হয়েছে, অবশ্য সেটা প্রতিবেদিত হয়েছে গ্যান্‌ৎসীট (Ganzheit) নামক আর একটি ব্যাপকতর তত্ত্বের পরিচয়ে। অভিজ্ঞতারূপ অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর এই মতবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় হিন্দুশাস্ত্রের রসাভাব, চিদাভাব ইত্যাদি ভাবকে। এছাড়াও এই পূর্ণ-অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রকাশে যে প্রবল ইচ্ছার রূপ আমরা দেখেছি, অনুভূতি ও প্রক্ষোভের ব্যাখ্যায় তার একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ক্রুগারের উপরোক্ত তত্ত্বটি আমি যথাযথ বুঝতে পেরেছি কিনা তা' সঠিক বলতে পারছি না। উদাহরণ স্বরূপ মনে হয়, তিনি যে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি-অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে যৌগিক পূর্ণতা বা গ্যান্‌ৎসীটের প্রতি নোদনার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার কোন চেষ্টাই করেন নি। যখন তিনি দেখালেন সর্বতোরূপে অভিজ্ঞতা সংজ্ঞানকে ভরিয়ে রেখেছে, তখন কি তিনি ধরে নিয়েছিলেন অনুভূতিই অভিজ্ঞতার পটভূমি ? অনুভূতিগুলি কি যৌগিক পূর্ণতার একটি বৃত্তি (function), না এগুলি মানসিক সংগঠনের অংশগুলির মাত্রা ও গুণের সংযোগে পূর্ণতা প্রাপ্তির হেতু ? এটা সত্য যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় একটি অনবচ্ছেদক গুণমানের ভিত্তিতে। কিন্তু কখনো কখনো, যেমন, দ্বি-অস্মিতা (double personality) বা বহু-অস্মিতা (multiple personality) সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই অনবচ্ছেদকের মাঝে বিপজ্জনক ভাঙনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এছাড়াও আমার মনে হয় সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতায় তথাকথিত অনবচ্ছেদক গুণমানের আংশিক কারণ হিসাবেও নির্জ্ঞান-মনের তথ্যগুলিকে আমল দেওয়া হয়নি।

জেমস্-ল্যাঙ্গের প্রান্তিক তত্ত্বের (peripheral theory) সমর্থনে ক্লেপারেদি যা বলেছেন তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু তিনি মূল সমালোচনাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। শারীরবিদ্যার বিচারে বলা যায় আমরা যে প্রক্ষোভগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করি সেগুলি আমাদের অবয়বিক পরিবর্তনের (organic changes) সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই উক্তির দ্বারা প্রক্ষোভের গুণগত ভাব সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। তাই শুধুমাত্র শারীর-বিদ্যার মাধ্যমে প্রক্ষোভকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলে তা হয়ে পড়বে সর্বতোভাবে একমুখী। ক্যানন, বেথ্‌টেরেভ এবং অন্যান্যদের প্রক্ষোভ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ও

উচ্চমানের শারীরতাত্ত্বিক গবেষণাদির কথা কেউই অস্বীকার করেন না। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাঁদের ও চেষ্টিতবাদীদের উদ্দেশ্যে প্রিন্স্ যা' বলেছেন তা' সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে বলি—"ঈশ্বর আপনাদের গতি দিন; যান, যতদূর পারেন যান; কিন্তু কোথাও কোন সময়ে আপনাদের এমন কোন পাথরের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে যখন আপনারা সেই অভিজ্ঞতায় চেতনা লাভ করবেন।"

ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্লেপারেদি প্রক্ষোভকে ব্যবহারের প্রত্যাবৃত্তি (regression of conduct), এবং হাওয়ার্ড (Howard) এটিকে মানসিকতার সম্ভেদ (disruption) বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে অনুভূতিকে প্রক্ষোভের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন কিন্তু হাওয়ার্ডের মতে প্রক্ষোভ-চেতনার কেন্দ্রস্থলে সংবেদন বা অনুভূতির উপাদানাদি থাকে না। অবশ্য আমরা পরে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে পারব যেখানে তিনি বলেছেন—"বোধ হয়, আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্তর্দর্শনবাদীরা (introspectionists) যাকে অনুভূতি-স্বণ (affective tone) বলেন বা বলবার চেষ্টা করেন, তা বর্তমান।"

বিভিন্ন নীতির ওপর ভিত্তি করে অনুভূতিকে প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। ক্লেপারিদি বলেছেন—"আমাদের ব্যবহারে অনুভূতির উপযোগীতা আছে কিন্তু প্রক্ষোভের কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।" গুণ ও তীক্ষ্ণতা ছাড়াও অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে গভীরতার বিচারে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টাও হয়েছে। "একটি যাত্রী ভর্তি জাহাজ-ডুবির ঘটনার থেকেও যে একটা সূঁচ ফোটার ব্যথা আমার বেশী লাগে একথা ঠিক কিন্তু প্রথমটি অতি অবশ্যই আরও গভীর ব্যথা।" ম্যাক্‌ড্যুগাল (McDougall) -এর মতে বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতি একটি যৌগিক ক্রিয়া আর সেটা কেবল সুখ ও দুঃখের মধ্যেই আনাগোনা করে না। ব্যক্তি-মানসে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-শক্তি বিকাশের সাথে সাথে এই যৌগিকত্ব সৃষ্ট হয়। তবে যৌগিক অনুভূতিগুলিকে প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করেই বিচার করা উচিত। এইগুলি আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতার পরিমাপের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচেষ্টাদির পূর্বাপর কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। "অপরপক্ষে, বিবর্তনের মান-এ শুদ্ধ প্রক্ষোভ যৌগিক অনুভূতিগুলি অনেক আগেই প্রকটিত হয়েছে' বলে অনুমিত হয়।" হয়ত যৌগিক বা জটিল অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের পরে সৃষ্টি হয়েছে বলে, তাদের প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানো সম্ভব হয়েছে, —কিন্তু সরল অনুভূতিগুলি? ম্যাক্‌ড্যুগাল বর্ণিত সরল প্রাথমিক অনুভূতির সঙ্গে প্রক্ষোভের বিষম-নির্ণায়কটির পরিচয় কি?

কেউ কেউ অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় (passive) এবং প্রক্ষোভকে কোন পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ামূলক প্রতিন্যাস (attitude) হিসাবেও দেখিয়েছেন। টিচেনারের মতে এটি কতকগুলি প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু মধ্যবর্তী বহু ক্ষেত্রে এই সত্যতার যথার্থতা স্বীকৃত হয়নি।

অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য একটি পার্থক্যেরই আন্দাজ আমরা করতে পারি, তা হ'ল তাদের জটিলতার মাত্রায়। অনুভূতি ও প্রক্ষোভ একই মানসিকতা থেকে জাত, কতকগুলি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূতি প্রক্ষোভের রূপ নেয় এবং একইভাবে প্রক্ষোভ অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

মনস্তত্বের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সাধারণভাবে দেখান হয় যে মনোযোগ (attention) অনুভূতির বিলোপ করে আর প্রক্ষোভ চিন্তাশক্তির গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। প্রাত্যহিক প্রতীয়মান এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও কিছু গভীর অর্থ নিহিত আছে যা এ পর্যন্ত দেখাবার চেষ্টা হয়নি। চিন্তার দ্বারা প্রক্ষোভকে সীমিত করা বা প্রক্ষোভের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথাই মনে হয় যে, চেতনার মধ্যে এই দুই মানস-ক্রিয়ার অবস্থান একসাথে সম্ভব নয়। যদি আমরা ধরে নিই এগুলি একই শক্তির দুইটি রূপান্তর, তবেই একটির বিনিময়ে অপরটির বৃদ্ধি বা বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ এই ধরণের রূপান্তর নিজস্ব শক্তির মাত্রা ছাড়ায় না, অর্থাৎ একটি অপরটির সর্বশক্তি আত্মস্থ করে না যাতে কিনা অন্য কোন রূপান্তর আর সম্ভব হয় না। তবে অনেক চরম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, যেখানে উপরোক্ত ঘটনাগুলি, যেমন চিন্তা প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রিত করছে বা প্রক্ষোভ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে,—একথা মনে আসে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে, এ যাবৎকাল, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিচয়ে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি-বিকাশ সংক্রান্ত রূপান্তরকরণের বিষয়টির প্রতিই প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজ চালু আছে। এই রেওয়াজের বিভিন্ন দোষ সম্বন্ধে আধুনিক শিশু-মনস্তত্বের গবেষনায় জানা গেছে এবং টেরী-র পুস্তকেও প্রক্ষোভ-শিক্ষার অভাবজনিত বিপদেরও নানা উল্লেখ আছে। শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় বা আদিবাসীরা সভ্য মানুষের তুলনায় বেশী আবেগ-প্রবণ—এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। এখানে আমার বক্তব্য হ'ল, জাতিজনিত (phylogenic) এবং প্রচরজনিত (ontogenic) উদাহরণগুলির মাধ্যমে যে সত্যটির উদ্ঘাটন হয়েছে তা হোল অনুভূতি ও প্রক্ষোভ মানুষের আদিম মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির ভিতর থেকে বা এর বিনিময়ে অন্যান্য মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন ব্যক্তির, তিনি সাধারণ অসাধারণ বা বায়ুগ্রস্ত—যে ধরণেরই হোন না কেন, তাঁর চিন্তাধারা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়তি নিহিত রয়েছে, তিনি কিভাবে তাঁর

অনুভূতিগুলিকে চালনা করেছেন তার ওপর। টিচ্‌নার অনুভূতিকে অস্বচ্ছ সংবেদন (unclear sensation) হিসাবে দেখিয়েছেন ; এই সংজ্ঞাটি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ তাঁরা অভিরাগ ও প্রক্ষোভের অত্যাচারকে উত্তরণ (transcended) করতে সক্ষম হ'য়েছেন। অবশ্যই এই বক্তব্যের দ্বারা বিজ্ঞতার এই সংজ্ঞাকে আমি সমর্থন করি— এই ধারণা ঠিক নয় ; আমি যা' বলতে চাই তা হোল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার প্রক্ষোভ-যন্ত্রাদির বিনিময়েই গঠিত হয়েছে।

প্রক্ষোভ (perception)-এর কথাই ধরা যাক। এটা যে কেবল প্রকৃতিগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল—একথা জানার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। দেখা গেছে আতঙ্কিত অবস্থায় অন্ধকারে গাছের ঝোপকে ভালুক ব'লে মনে হ'তে। প্রত্যক্ষের এই ধরণের বিষয়গত পরিবর্ত্তনের জন্য কিন্তু সবসময়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রক্ষোভ উদ্দীপনের প্রয়োজন হয় না। মাত্রাতিরিক্ত তীব্র প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে যে ধরণের মানসিকতার সৃষ্টি হয়, সাধারণ অনুভূতির ক্ষেত্রে তাই ঘটে স্বমিত (normal proportion) মাত্রায় যেটা ক্ল্যুগারের মতে 'অনুভূতির ন্যায় একটা কিছু অভিজ্ঞতা'। আমাদের দেশে এবং বিদেশেও সমসাময়িককালে ওজন-পরিমাপের ওপর বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ওজনের ধারণা ও ওজন-বিনিশ্চয়তার (difference beween weights) ক্ষেত্রে প্রতিন্যাস যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে তা' প্রমাণিত হ'য়েছে। সরল পরীক্ষা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষের অন্যান্য দিকেও বসু (Bose) এই ধরণের ঘটনাবলীর প্রমাণ দিয়েছেন (Bose, G. Is perception an illusion ? Indian Journal of Psychology, 1926, 1, 135)। হলিংওয়ার্থ (Hollingworth)-এর মতে প্রত্যক্ষের সৃষ্টি হয় কোন সূত্রের (clue) ব্যাখ্যা থেকে, আর তাই প্রত্যেক ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষেরও পরিবর্ত্তন আসে। আর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স, স্ত্রী-পুং ভেদ, শিক্ষা ও মেজাজের ওপর নির্ভর করে। এর অর্থ হোল ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, ব্যক্তিমানসে আদি অনুভূতি (original feelings)-গুলির গঠনপ্রক্রিয়া ও সেগুলির পরিবর্ত্তনের উপর।

অন্যান্য মানস-ক্রিয়া, যেমন স্মৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বিকল্প মনোবিদ্যা (differential psychology) এই ধরনের পার্থক্যগুলিকে যথার্থ পরিমাপের ভিত্তিতে মাত্রিক (quantitative) পরিচয়ে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছে। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বই কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য সৃষ্টিতে অনুভূতির অবদানকে প্রদর্শিত করেছে। প্রাত্যহিক মনোরোগবিদ্যা, নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের বিস্মৃতি, কথা-বার্ত্তার ভুল ইত্যাদি দৈনন্দিন নানা ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করেছে। এই সূত্র ধরে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা যায় তবে তাঁর স্মৃতির স্বরূপকে

বোঝা সহজ হয়। অনুভূতি-সংক্রমণ এবং প্রসারণ (affective transfer and expansion) বর্ণনায় টিচেনার মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও চিন্তার মাঝে অনুভূতির প্রভাবের গুরুত্বকে স্বীকার করার মুখে এসেও, শেষ কথাটি বলা থেকে নিবৃত্ত হ'য়েছেন। তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞান-অভিজ্ঞতা তত্ত্বের সঙ্গে এই ধরণের বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'ত না। তাঁর এই নিবৃত্তি হয়ত অনেকের কাছে সুখবর হ'তে পারে, তবে আমি মনে করি, এটা সম্ভব হ'য়েছে তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনিময়ে। সমসাময়িক মনস্তত্ত্বের ইতিহাসে টিচেনার একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর অবদান আমেরিকার মধ্যেই কেবল আবদ্ধ থাকে নি। আমি অনেক সময়ে কল্পনা করেছি, যদি আজ তিনি তাঁর স্ব-নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু সরে এসে, একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে দেখ্‌বার চেষ্টা করতেন, তবে আজ তাত্ত্বিক-মনস্তত্ত্ব কতটা উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান পেত!

আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন মনস্তত্ত্বের নবমতাদর্শীরা টিচেনারের এত বিরোধীতা ক'রেছেন। চেষ্টিতবাদীদের সম্বন্ধে আমার এখন কিছু বলার নেই, কারণ যা বলবার তা আগেই বলেছি। গেষ্টাল্ট্ মতাদর্শীরা সবরকম মনোবিশ্লেষণের বিরোধীতা করেছেন এবং বিচলন-প্রত্যক্ষ (movement perception)-এর ক্ষেত্রে তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি টিচেনার-তত্ত্বের মৃত্যুদূত হয়ে এসেছে। এঁদের মতে বিচলন-প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত কিন্তু এটাও আমি বলতে চাই যে টিচেনার স্বয়ং এ সব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অপারগতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিছু অভিজ্ঞতার গঠনে মৌলিক উপাদানগুলি ছাড়াও আরও কিছু থাকে যাকে 'কর্টিকাল সেট' (Cortical set) নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপ হোল প্রতিন্যাস। ঠিক এই ভাবটিই গেষ্টাল্ট মতবাদীদের বিচারে প্রকট হয়ে উঠেছে যখন তাঁরা বলেছেন, সব লোকই 'ফাই-ফেনোমিনা' (Phi-phenomenon) দেখতে পান না।—এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষের ফাই-ফেনোমিনা দেখ্‌বার পূর্ব্বে বিচলন-প্রত্যক্ষণের প্রতি তাঁর সাধারণ প্রতিন্যাসের অবস্থিতি ওঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন। বিশ্লেষণ করা, প্রত্যেক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই, তা ভৌত-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান যা'ই হোক না কেন, একটি প্রধান কর্ত্তব্য এবং বস্তুনিরপেক্ষ-স্তর ((abstraction stage) পর্য্যন্ত এই বিশ্লেষণ ক'রে যেতে হবে। ইথার, ইলেক্ট্রন, আয়ন কিংবা পরমাণু—প্রত্যেকটিই প্রত্যয়িত বিচারে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ধারণা। সেইরকম ধারণাই করা হ'য়েছে সংবেদন ও অনুভূতিকে নিয়ে। ভৌতজগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, একটি অনবচ্ছেদক পরস্পর-সম্পর্কান্বিত পরিচয়ের প্রকাশ এবং সব অংশই পূর্ণ, অখণ্ড—একটি গেষ্টাল্ট্। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদন-প্রত্যয় বা বৈশ্লেষণিক পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে তো পড়েই নি বরং মনস্তাত্ত্বিক বিচারে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে গন্য হবে।

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগ-চিকিৎসার ক্রম-বিবর্তন

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

["চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের ধারা" শীর্ষক যন্ত্রস্থ পুস্তকের "মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন" অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বহু সামাজিক কর্মীর প্রচারের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ক্রমশঃ অধিকভাবে উন্মাদাগারগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল। পাইনেল, (Pinel) ফ্রান্সে এবং কনোলী ব্রিটেনে বন্দীদের আরও অধিকতর উদার ব্যবহার ও মুক্ত অবস্থায় চিকিৎসার উপর জোর দিতে লাগিলেন। টুকে প্রত্যেককে উপযুক্ত কাজে মন আবদ্ধ রাখিবার বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সর্ব দিকে আমূল পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অগ্রগতি সেই সময় হইতে এখনও-পর্যন্ত অব্যাহতগতিতে চলিয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ ঔষধাদি ব্যবহারেও উন্নতি হইতে লাগিল। সামাজিক কর্মীগণ ক্রমশঃ আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের সহিত উহাদের পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাহাদের পরিবারে প্রত্যাবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিলেন (Rehabilitation) এবং সব সময় তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য এবং আরোগ্যোত্তর যত্নের জন্য বিবিধ সংস্থা ও আবাসের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের উপযুক্ত চাকুরীরও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর উন্মাদ-রোগীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রেরণাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ ক্রেপেলিন (kraepelin) বিভিন্ন প্রকার উন্মাদ-রোগের মধ্যে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থা ছিল, তাহা দূর করিলেন। একটি শ্রেণী বিভাগ প্রস্তুত হইল (classification) যাহা দ্বারা উন্মাদ-রোগীদের চিকিৎসায় প্রভূত উপকার হইল।

এই উন্নতির অগ্রগতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ও শেষার্দ্ধের সহিত তুলনা করিলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ টমাস্ মনুরো (Thomas Monroe) রাজকীয় বেথেলহেম্ হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি উন্মাদাগার-অনুসন্ধান কমিটির সভ্যদের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেন, "চিকিৎসার সুবিধার জন্য আমাকে বহু রোগীকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বহু বৎসর হইতেই তাহাদের ঐ অবস্থায় রাখা হইয়াছে। মে মাসের প্রথম ও শেষের দিকে প্রত্যেক রোগীর শরীর হইতে রক্ত নিঃস্বরণ করা হয়। তাহার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ তাহাদের "বমন-পদার্থ" খাইতে দেওয়া হয়; এবং তাহার পর আমরা রোগী-দের কয়েকবার জোলাপ দিয়া শরীরের ক্লেদ পদার্থ বাহির করিয়া ফেলি। এই ব্যবস্থা বহু বৎসর অবধি প্রচলিত আছে এবং আমার পিতামহের সময় হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। আমার মতে ইহাই উন্মাদদের প্রকৃত চিকিৎসা।" সমিতির সভ্যগণ দেখিতে পান রোগীদের একটি লম্বা লৌহদণ্ডের সহিত শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অতি কষ্টে উহারা দাঁড়াইতে ও বসিতে পারে।

মানসিক রোগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। স্নায়ু-প্রবণতা বা স্নায়বিক-বিকার অথবা মনোবিদ্যার পরিভাষা অনুযায়ী উন্বায়ু (Neurosis) মানুষের অনুভূতি, প্রেরণা ও বুদ্ধির বিকারমাত্র। ইহা কেবলমাত্র সব মানুষই যাহা অনুভব করে অথবা প্রকাশ করে তাহারাই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ। কিন্তু বাতুলতা (Psychosis) (কাল্পনিক বিকার) মানবের স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ নয়। উহা অবাস্তব-কল্পনার বিকারমাত্র। উহা কল্পনার জগৎ।

এই বিকারগ্রস্ত রোগীদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে মানব-মনের অভ্যন্তরে আর একটি সীমাহীন কল্পনাতীত বিস্তৃত জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আমরা আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োগ-পদ্ধতির ধরণ বুঝিতে পারিব। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের রোগের প্রকাশ—বাতুলের সাধারণ পক্ষাঘাত রোগ (General Paralysis of the insane)। এই রোগের সাধারণ লক্ষণ, রোগীর অস্মিতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন, স্মরণ-শক্তির হানি, ক্রমশঃ দুর্বলতা বৃদ্ধি, বাক্যের বিচ্যুতি, বিবিধ রকম স্নায়বিক বৈকল্য ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত; অব-শেষে অচিকিৎসিত অবস্থায় থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই এই রোগ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে ১৮২২ হইতে ১৮২৬ এর মধ্যে বেইল (Bayle) এবং ক্যালমিল্ (calmeil)

দেখাইলেন যে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশের ঝিল্লি ও স্নায়ু-পদার্থের সাধারণ প্রদাহজাত ক্ষত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার পর হইতে পরিসংখ্যান ও আনুষঙ্গিক নানা সাক্ষাৎ হইতে ক্রমশঃ ইহার বিষয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল যে পুরাতন উপদংশ রোগ হইতেই ইহার উৎপত্তি। অবশেষে হাইদেও নগুচি (Hideyo Noguchi—1876-1928) এবং জোসেফ্ ওয়াল্ডন্ মুর (Joyeph Waldron Moore—1879) ঘোষণা করিলেন যে তাঁহারা ৭০টি সাধারণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ উন্মাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া ১৪ টির মধ্যে উপদংশ বীজাণু পাইয়াছেন। এইরূপে প্রমাণ হইল যে সাধারণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ উন্মাদ-রোগ মস্তিষ্কের একটি অংশের পীড়া হইতে উৎপন্ন। এইরূপে অতিরিক্ত মদ্য, আফিম, গাঁজা প্রভৃতি সেবনের পর মস্তিষ্কের প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মস্তিষ্ক হইতে একই প্রকারের উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়। আবার বার্দ্ধক্যজনিত উন্মাদ-রোগ রক্ত-সঞ্চালনের অভাবে মস্তিষ্কের অবক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে 'আব' (Tumour) হইলে অথবা রক্ত-মোক্ষণ হইলে (Hemorrhage) তাহা হইতে উৎপন্ন চাপে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালনে ব্যাঘাত হয়—তাহাতেও মস্তিষ্কের প্রদাহ হয় ও ক্ষমতা লোপ পায়।

এইরূপ স্নায়ু-প্রধান ও কল্পনা-প্রধান বিকারের পৃথকীকরণের ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করিয়া ফ্রঞ্জ য্যাণ্টন্ মেস্মার (১৭৩৪—১৮১৫) নামক একজন অষ্ট্রিয়ানিবাসী হাতুড়ে চিকিৎসক বহু অর্থ ও যশ অর্জ্জন করেন। ডাক্তারীতে স্নাতক পরীক্ষার সময় তাঁহার বিশেষ রচনা "গ্রহ নক্ষত্রাদির মানবের উপর প্রতিক্রিয়া" বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই প্রতিক্রিয়া একটি চুম্বকের দ্বারা রোগীর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার পর তাঁহার মনে ধারণা হইল যে মানুষের হাতের দ্বারাও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া অথবা শক্তি কার্য্যকর করা যাইতে পারে। তিনি ইহাকে 'জৈবিক শক্তি' আখ্যা দিয়াছিলেন। ভাগ্য তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন ছিল। এক অষ্ট্রিয় রাজ পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ ভদ্রমহিলার সম্ভবতঃ হিষ্টিরিয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে মেস্মার সুকৌশলে আরোগ্য করিবার পর তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য ক্রমশঃ দীপ্তিমান হইতে লাগিল। তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আমন্ত্রিত হইলেন এবং সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে তিনি দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাঁহার শক্তি রোগীর শরীরে সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহার পর তিনি এক বৈঠকে সমবেত সকলের উপর একসঙ্গে ঐ কাল্পনিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া মনোমত ফল লাভ করেন। তিনি ভোজবাজীকরদের মতন নানা সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কার করেন। একটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, তিনি একটি পাত্রের চতুষ্পার্শ্বে দর্পণ স্থাপন করেন ও লৌহশলাকা দ্বারা শক্তি সঞ্চালন করিতে পারেন এইরূপ পরিকল্পনা

করিয়া ঐ যন্ত্রটি একটি টেবিলে স্থাপন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে রোগীদের বসান ও তাহাদের একে অপরের হাত ধরিতে বলেন। ইহাকে 'মেসমারের ব্যাকেট' (Mesmer's Baquet) বলা হইত। মেস্‌মারের নাম দিক্-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। তখন প্যারিসে সমস্ত চিকিৎসকমণ্ডলীতে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অবশেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসক সভা (Academy) তাঁহার সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। তাঁহাদের রিপোর্টে তাঁহারা জানাইলেন যে,—"জান্তব চৌম্বকশক্তির" কোন অস্তিত্ব নাই। যে অভাবনীয় শক্তির ক্রিয়া মেস্‌মার তাঁহার বৈঠকে প্রয়োগ করেন তাহা রোগীদের কল্পনার ক্রিয়া মাত্র। অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের সময় মেস্‌মার ফরাসী দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু তিনি পরে বহুবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ও শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ যাহাই বলুক না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মেস্‌মারের লোককে আকর্ষণ করিবার অসীম শক্তি ছিল এবং তিনি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানসিক-দুর্বল রোগীর উপর নিজের কল্পনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছামত, ঘুমন্ত অবস্থায় রোগীরা কাজ সম্পন্ন করিত। তাহার পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার জাকুইস ফ্রাঙ্কইস বারট্রাণ্ড (১৭৯৫-১৮৩১) প্রথমে এই "হিপ্‌নটিক" অবস্থা দর্শন করেন এবং কল্পনার নিয়মসূত্রে ইহার সুচারু ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে নানা দেশে এই বশীভূত অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ হিষ্টিরিয়া রোগীদের রোগ উপশমে ইহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মেস্‌মেরিজম্ অবশেষে হিপনটিজম্ নামে পরিচিত হইল। বিখ্যাত চিকিৎসক সার্কো (Charcot) হিষ্টিরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে হিপনটিজ্‌ম্ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

ধৈষণা

তরুণ চন্দ্র সিংহ *

অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবার কথাটা কবে হইতে প্রচলিত আছে জানা নাই। কথাটা যে কত বড় সত্য তাহা আজিকার দিনের মানুষকে আর বুঝাইয়া বলিয়া দিতে হইবে না—আমাদের দেশের অভাব তো চারিদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বলিতে যাইতেছিলাম বর্ষার মেঘের মত আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখনই মনে হইল বর্ষার ঘনঘটা যতই হউক এক পসলা বর্ষণের পরে, ঝড়ের-ঝাপটায় কিছু তছনছ হইয়া আবার মেঘ পাতলা হইয়া যায়—আলো দেখা দেয়। আর তাহার মেয়াদ খুব বেশী হইলেও দুই-তিন দিনের বেশী নয়, এমন কি বর্ষাকালটাই দুই মাসে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু দেশের দুরবস্থার হিসাব করিতে হইলে তিরিশ দিনের বদলে কত বৎসরে মাস গণনা করিতে হইবে তাহা হিসাব করিতে পারা যাইতেছে না। সুতরাং বর্ষার মেঘের মত অভাব আমাদের জীবনের সর্বদিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে এ কথা আর বলিতে পারিলাম না। অভাব যেসকল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তালিকা রচনা করাও সম্ভব নহে। সকলেরই জানা আছে এই পরিস্থিতির সুবিধা সুযোগ লইয়া বেশ কিছু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের লোভের পরিপূরণ করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনের জল-নুন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সহিত স্বার্থান্বেষী লোভাতুর বিদেশী শক্তিরও অদৃশ্য বা অলক্ষ্য কারসাজির কথাও শোনা যায়। ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই! স্বার্থ যখন প্রবল রূপ ধারণ করে তখন তাহা দেশী-বিদেশী যাহাই হউক, কোনও ন্যায়-নীতিকে আদর্শকে পদদলিত করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। দশ হাতে দশ দিক হইতে তাহারা নিজেদের স্বার্থে তাণ্ডব সুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশের অবস্থার দিকে তাকাইলে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ আর তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না।

এই পরিণতির মূলে অন্যান্য যে কোনও কারণই দেখানো হউক না কেন, আমাদের জীবনের আদর্শভ্রষ্ট হওয়াতেই এই দ্বিধাহীন উলঙ্গ ব্যক্তি-স্বার্থের এমন উৎকট বিকৃত রূপ সমাজ-জীবনের চারিদিকে, তথা দেশের সর্বত্র ফাটিয়া পড়া সম্ভব হইয়াছে।

---

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

এই আদর্শহীনতার কথা আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র যে শক্তিহীন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে বহুবার। প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করিতেও এই সত্য সকলেই অনুভব করিতেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। রাজ্য পরিচালক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেদের দলের স্বার্থে—নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি ও রাজ্যাসন অধিকার করিবার লোভে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-সুবিধার কথা প্রায় অস্বীকার করিয়া, তাহাদের আদিম আক্রম-বৃত্তিকে উস্কাইয়া দিয়া দেশের শান্তি ও নিরাপত্তাকে লইয়া যথেচ্ছ ছিনিমিনি খেলিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করে না। পরিবারের দুঃসময়ে ভাই-ভাইয়ে মিলিয়া-মিশিয়া দুর্দশা দূর করিবার বা তাহা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়াইয়া তুলিয়া ভাঙ্গনের পথ, ক্ষতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আমাদের রাজনীতিকদের সেই স্বার্থের দ্বন্দে পড়িয়া সাধারণ মানুষের জীবন অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই ভাঙ্গনের স্রোত, সর্বনাশা বিপর্যয়ের গতিরোধ করিবে কে? তেমন কোনও শক্তিমান দৃশ্যপটে আজও দেখা যাই-তেছে না। দুর্বল যখন শক্তিমানের খেলা দেখাইতে যায় তখন তাহার বিকৃতি আরও প্রকট হইয়া দেখা দেয়। দেশের সমাজ-জীবনের সর্ব দিকেই এই বিকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোগ্যের হাতে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িলে তাহা অবস্থার দুঃসহতাকেই বাড়াইয়া তোলে। এই তো গেল তথাকথিত উপরওয়ালাদের অবস্থার কথা।

আমাদের মত দেশের সাধারণ মানুষ, যাহারা সাতে-পাঁচে ঘা খাইয়া, মোটামুটি সুখে-শান্তিতে, থাকিয়া দুই বেলা খাইয়া, সাধারণ পরিধেয় ও আশ্রয়ের নিরাপত্তাটুকু পাইয়া জীবন কাটাইতে চাই, যাহার যতটুকু সাধ্য সেই অনুসারে সমাজকে, দশজনকে কিছু দিয়া জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, তাহাদের জীবনে যখন সবদিক হইতে নানা সমস্যা আসিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে—জীবনের সাধারণ সামান্য আশা-ভরসাগুলিও লোপ করিয়া দিতে থাকে তখন সাধারণ মানুষ, আদর্শহীন সমাজ-অবস্থায়, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তির দিকে সহজেই চালিত হয়। 'এই অবস্থায় নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে হয় সমস্যায় জর্জরিত হইয়া, উদ্ধারের পথ না পাইয়া, দলিত-পীড়িত হইয়া ক্লিষ্ট জীবনের দিকে ঢলিয়া পড়ে, না হয় সমস্যার সহিত তাল রাখিয়া অবস্থা বুঝিয়া অদূর ভবিষ্যতে সুদিন কাটিয়া যাইবার আশায় জীবন-যাপন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। আর এক শ্রেণীর মানুষ সমস্যায় অধীর হইয়া নিজেদের আদিম আক্রমবৃত্তিকে মূলধন করিয়া ভাঙ্গনের পথে তাণ্ডব সুরু করিয়া দেয় :—এই তৃতীয় শ্রেণীর জনসাধারণকেই বিশেষ রাজনীতিবাদীরা দামামা বাজাইয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তোলেন। তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেশে অশান্ত ও অনিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের দলগত স্বার্থ-পূরণের

জন্য অরাজকতার সাহায্য করিতে থাকেন। মুখে যতই বড় বড় জনহিতকর বুলি আওড়াইয়া, আদর্শের নামাবলি গায়ে জড়াইয়া, কীর্ত্তন করুন না কেন, একবার সিংহাসনে বসিতে পারিলে আবার ইহারাই যে তাণ্ডবীদের মাথা হাতে কাটিতে এতটুকুও দ্বিধা করিবেন না। এজন্য শক্তি চাই—ভাঙনের স্রোতের সহিত যদি গঠনের, সৃজনের পলিমাটি না থাকে তবে সে অন্ধ আক্রমবৃত্তি নিজেকেই ধ্বংস করিয়া বিনষ্ট হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত চরিত্রের মানুষদের লইয়া সমস্যা জর্জরিত সমাজে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের করাল ছায়া ক্রমে ঘনতর কঠিন রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বহু যুগের বহু চেষ্টায় যে আদিম আক্রমবৃত্তিকে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া বশ মানাইয়া জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিস্থাপন করিবার, সভ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার, অনলস চেষ্টা করিয়া আসিতেছে সেই চেষ্টা বারে বারে বিঘ্নিত হইয়াছে;—অন্ততঃ খণ্ডিতভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। মহাভারতের মহাকাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণের মত মহাশক্তিমানকেও মহাকালের স্রোতের নিকট হার মানিতে হইয়াছে। কালের গতি অপ্রতিরোধ্য এই কথা যদি মানিয়া লইতেও হয় তবু এই কথাও তো অস্বীকার করা যাইবে না যে মহাকাল যত প্রবলই হউন, রুদ্র যতই প্রখর হউন না কেন তবুও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিশেষ করিয়া মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে এই তিনটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, শক্তিই আমাদের প্রত্যেকের মনেই আছে। কাহারও মধ্যে কোনওটার প্রভাব বা ক্রিয়া অন্য দুইটি অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। এই তিন শক্তির সমন্বয় নষ্ট হইলে ব্যক্তি-মানসে যেমন বিকার দেখা দেয় সমাজ-জীবনেও যদি এই ত্রি-শক্তির সুস্থ সমন্বয় ব্যাহত হয় তবে সমাজ-জীবনও বিঘ্নিত হয়। মানুষের আক্রম-বৃত্তির এক বিকাশ হয় ধ্বংসে। মানুষ যখন আক্রোশের বশে ধ্বংসে মাতে তখন তাহাকে বিকার বলা চলে। আমাদের সমাজ-জীবনে সেই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা এই বিকারের স্রোতে গা-ভাসাইয়া দেন নাই, তাঁহারা ইহাকে রোগ-লক্ষণ জানিয়া নিজেদের সুস্থতা বজায় রাখিতে ও বিচার-বিবেচনা করিয়া অবস্থানুসারে বিকারগ্রস্তদের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট না হইলে এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লব সমাজকে গ্রাস করিবে। এই পরিণাম হইতে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে ও দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের উপরেই ন্যস্ত আছে। আমরা কে কতটা সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া সেই অনুসারে নিজ নিজ জীবন চালিত করিব তাহার উপরই আমাদের জনসাধারণের তথা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। সমস্যা যখন ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও আমরা সেই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কি ভাবে তাহার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইব তাহা আজও যেন ভাবিয়া ঠিক করিয়া

চলিবার মত সজাগ হইয়া উঠিতে পারি নাই। এই খণ্ড প্রলয়ের কালগ্রাসে পড়িয়া অহেতুক ধ্বংস হইবার পূর্বে আমরা কি জাগিয়া উঠিব না! আমরা কি পশুর মতই স্বার্থপরদের লোভের মৃতকল্প ক্রীড়ণক হইয়া মরিব! ধ্বংসের শক্তিকে সৃজনের শুভ-শক্তিদ্বারা বশীভূত করিবার, জীবনের মর্যাদাকে ধ্বংসের উর্দ্ধে স্থাপন করিবার আবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জ্ঞানী-গুণী, কর্মী ও বিশেষ করিয়া যুব-সমাজকে আরও গভীরভাবে ভাবিয়া জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় বর্তমান সমস্যাগুলিকে তুলিয়া ধরিয়া বিচার করিয়া নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করিতে ও সেই নির্দ্ধারিত কর্মে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাই। আর দেরী করিবার সময় নাই। যোগ্য শুভ কর্ম চাই। মানুষের বিধ্বংসী দানব-প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না! ইহা জীবনের, ইতিহাসের পরাজয়। বিনাশের উপরে জীবনের আসন স্থাপন করিতে হইবে, ধ্বংসের উপরে সৃজনের।

জীবনাদর্শ বিহীন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানে দ্বন্দ্ব বৈপরিত্যপূর্ণ সমস্যা-জর্জরিত জীবনযাত্রা আর সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে পারিতেছে না। আমাদের মধ্যে যাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা কিছু যদিও বা থাকিয়া থাকে তথাপি ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। অনেকেই তাই গতানুগতিক ধারার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলি। অসুবিধায় পড়িলে বিরক্ত হই, রাগ করি, সরকার হইতে সুরু করিয়া আশে-পাশে যাহাকে পাই তাহার উপর দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজের আবেগ কিছু পরিমাণে শান্ত করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে কথা অনেক হইতে পারে, তর্ক চলিতে পারে, সময়ও বহিয়া যায়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। ফলে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া এত উষ্মা প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল সেগুলি তেমনই থাকিয়া যায় প্রতিকারের জন্য চেষ্টা টুকুও করা হয় না। অপরের উপর দোষ চাপাইয়া নিজের মনের ভার লাঘব করা যদিও বা কিছুটুকু সম্ভব হয় অবস্থার পরিবর্তন কিছুই তাহাতে হয় না। নিজের আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু ভাল করিবার থাকে সেটুকুর জন্যও আমরা চেষ্টা করি না। অসুবিধা তাই কাঁটার মত সর্বদাই মনে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে। সময় যত যায়—ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অসঙ্গত অবাধ আক্রোশে বা বিবাদে। কেহ কেহ ভাগ্যের উপর দোষ চাপাইয়া তিক্ত মনে দিন কাটাইতে থাকেন। ইহাদেরও মেজাজ ভাল থাকে না। সব মিলিয়া মনে সকল সময় এমন একটা অশান্তিকর অবস্থা চলিতে থাকে যাহার ফলে সামান্য কারণে এমন কি অন্যান্য কাল্পনিক কারণে-অকারণে যখন-তখন বিবাদ বাধিয়া যায়। ট্রাম বাস বা পথে, দোকানে, হাটে রোজই ইহার অতি সহজ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাতেই, কিছু কথা কাটাকাটিতেই, যদি গোলমাল মিটিয়া যাইত, তবেও না হয় বোঝা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সেই ঝাঁঝালো মনের জের প্রাত্যহিক জীবনে নানা পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে তাহা পাড়াগত, দলগত,

এমন কি তথাকথিত রাজনীতির পাকে-চক্রে পড়িয়া সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। অনেক সময় ইহা মারামারি, খুন-জখমে পরিণত হয়। এই আক্রম-বৃত্তির হিংসাত্মক পথে একবার চলা সুরু হইলে তাহার গতি রোধ করা কঠিন হয়। এক দুইকে টানে, দুই চারকে জড়ায়। এই করিয়া সমস্যা ক্রমে ঘোরালো হইয়া প্রতিশোধের মারামারি খুনোখুনি চলিতে থাকে। ইহার কুটিল কবল হইতে দলের লোকেরাই আর তখন সহজে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে না। এই কালচক্র সমাজ-জীবনকে নষ্ট করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। ইহার কালোছায়ার কবল হইতে সাধারণ মানুষ নিজেকে বাঁচাইয়া সহজ শান্ত সৃজনশীল জীবন-যাপন করিতে পারে না। সমাজের পক্ষে ইহা দুর্দ্দিন। আমাদের সমাজ-জীবনে এই দুর্দিনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। ইহাকে রোধ করিতে না পারিলে যে বিধ্বংসী বিপ্লবের নামে বাধাহীন অরাজকতা দেখা দিবে তাহা ভয়াবহ রূপ অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন না। আমরা উট পাখীর মত বালুতে বা নিজের পালকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পারিপার্শ্বিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম মনে করিতে পারি সত্য, কিন্তু তাহাতে যেমন স্বার্থ রক্ষা হয় না তেমনই আত্মরক্ষাও হয় না। নিজেদের চোখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিপদকে আরও কাছে ডাকিয়া আনা হয়। ইহার ফল যে কখনই শুভ হইতে পারে না তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। তবুও আমরা সাধারণ-ভাবে এই পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। আমাদের মানসিক জড়তা এত বেশী যে সময় মত সক্রিয় হইয়া সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সমস্যাকে যেন আমন্ত্রণ করিয়া নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে দিয়া তাহার চাপে পীড়িত হই, নিষ্পেষিত হই। অনেকের এ সম্বন্ধে অন্ধতার ওপরেও অহংকারের বোঝা আসিয়া যোগ দেয়। কিছু না করিয়াও যেন কত কিছু করিতেছি এমন একটা আত্মপ্রবঞ্চনার পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পথ চলেন। এই করিয়াই আমরা ডুবিতেছি। প্রতিকারহীন সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়া নাভিশ্বাস টানিতেছি।

সমস্যার কোনও প্রতিকার কিছুই নাই, এমন কোনও সমস্যাই নাই। মানুষের নিজের সৃষ্ট সমস্যার পরিমানই বেশী। তাহার প্রতিকারের পথও মানুষের হাতেই আছে। তাহা ছাড়া আর যেসব প্রাকৃতিক সমস্যা সময় সময় দেখা দেয় তাহারও অনেকগুলির সমাধান আমরা কম-বেশী করিতে পারি। মানুষ চেষ্টা করিয়াই ক্রমে প্রকৃতির অনেক তথ্য জানিয়া তাহাকে অন্ততঃ আংশিকভাবে জয় করিতে পারিয়াছে। চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে আরও বেশী করিয়া এই প্রাকৃতিক সমস্যাগুলিকে আয়ত্বে আনা যায়।

ইহা তো হইল বড় বিষয়ের বড় কথা যাহা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চেষ্টার কিছুটা বাহিরে। কিন্তু আমরা নিজেদের ছোট-খাটো বিষয়ের যে সব সমস্যা প্রত্যহ ভোগ

করিতেছি, আমরা নিজেরা তৎপর হইলে, তাহার অনেকখানি আমরা নিজেরাই সমাধান করিতে পারি। এ'জন্য সরকারকে প্রথমেই টানিয়া আনার দরকার হয়না। আমরা কয়েকজন একত্র হইয়া একটু বিচার-বিবেচনা করিয়া আমাদের বহু সমস্যার সমাধানের পন্থা ঠিক করিতে পারি। কিন্তু আমরা তাহা করি না। নিজেরা মনে মনে বিরক্ত বোধ করি। কাহারও সহিত দেখা হইলে দুই কথায় তাহা প্রকাশ করি। তারপরে আর কিছু করি না। ভাবখানা এই যে আমরা কিছু করিব না কিন্তু আমাদের সব সমস্যা দূর হইয়া যাক। তাহা না হইলেই ইহাকে-তাহাকে হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই ভাগ্য হইতে ভগবান পর্যন্ত সকলকে দোষ দিয়া থাকি। এই দুষিত পাকচক্রে আমরা ঘুরিয়া মরিতেছি। ইহা হইতে উদ্ধারের পথ পাই না একথা বলা চলে না। প্রকৃত কথা এই যে আমরা সেই উদ্ধারের পথের সন্ধানই করি না। সকল সময় পরনির্ভরশীল হইয়া চলিবার শৈশব মানস-বৃত্তি আজও আমাদের কাটে নাই। আমরা আজও অনেকাংশে শিশুই রহিয়া গিয়াছি। আমাদের বড় বড় কথার বোলচালও শিশুর রাজা-উজির মারা বা অনায়াসে চাঁদ লইয়া খেলা করিবার মতই মানসিকতার পরিচায়ক।

বড হইতে হইলে কেবল দেহের আয়তন বাড়িলেই চলে না। সেই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিক বোধেরও প্রবর্ত্তন হওয়া দরকার। এই জন্য প্রথম হইতেই আমাদের সম্মুখে কোনও আদর্শ স্থির থাকা দরকার। এই আদর্শ ঠিক না থাকিলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা ও তাহাতে নির্দিষ্ট গতির নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। হালভাঙ্গা নৌকার মত যেমন-তেমন স্রোতে বা ঝড-ঝাপটায় বিধ্বস্ত হইতেছি। আদর্শ স্থির না থাকিলে চলিবার দিক ও পথ কোথা হইতে কি দিয়া ঠিক করা হইবে ?

ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে এমন কি রাষ্ট্র-জীবনেও আজও আমরা কোনও আদর্শ স্থির করিতে পারি নাই। আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা এইখানেই। ফলে যাহার যেমন ইচ্ছা চলিতেছে। আজ এই নীতি, কাল অন্য নীতি। এখানে এই নীতি, অন্যখানে অন্য নীতি। অর্থাৎ যেখানে যেমন যাহার সুবিধা সেই অনুসারে সে অবাধে চলিতেছে। কোথাও যদি সামান্য নিন্দার কথা ওঠে তাহা এতই ক্ষীণ যে নিজেদের বাহবার ডামাডোলে তাহা কানে পৌঁছাইতে পারে না। তা ছাডা সমাজ শক্তি বলিয়া কিছু আর নাই বলিলেই চলে। যদিই বা কিছু থাকিয়া থাকে তাহার ক্রিয়াশক্তি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল। ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র চালনায় সেও পঙ্গু। সুতরাং দেশের নানা স্তরের মানুষের আদিম-বৃত্তির প্রকাশ সর্বক্ষেত্রে প্রকট হইয়া তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়াছে। এই ক্লিষ্ট, রুগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য কেবলমাত্র সেই দুর্বল রুগ্ন রাষ্ট্রশক্তির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ছোট হউক বড় হউক কয়েকজন মিলিত

হইয়া নিজেদের মধ্যে বিষয় আলোচনা করিয়া সমস্তার বাস্তব সমাধানের সাধ্যমত উপায় স্থির করিয়া কাজে নামিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর পথ নাই। নিজের বাড়ীর সংগঠন ও পরিচ্ছন্নতা, পাড়ার রাস্তা পরিষ্কার রাখা, দোকানের বাজারের অন্যান্য দ্রব্যমূল্য রোধ করা ইত্যাদি বহু কাজ আমরা নিজেরাই করিতে পারি। আমাদের সময়ের অভাব—এই কথা আদৌ সত্য নহে। এই যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। বলা উচিত আমরা মনের দিক হইতে অপরিণত শিশুর মত, অথবা নিজের জড়তায় পঙ্গু। প্রত্যেক পাড়ায় অন্ততঃ দুই চারিজন এখনও আছেন যাঁহারা সচেষ্ট হইয়া কিছু করিবার মানসিক শক্তি রাখেন। সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই প্রতি পাড়ায় সক্রিয় হইয়া কাজে নামিতে হইবে। অহংকারের বশে নহে, নিজের ও অপর দশজনের শুভ কামনায় এই কাজে ব্রতী হইতে হইবে। আর্থিক বা সম্মান লাভ বা প্রশংসার জন্য নহে, নেহাতই একটু ভালভাবে বাঁচিবার আশায়। একদিনই কিছু গড়িয়া উঠে না। তাই এই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। যখন যতটুকু সুফল পাওয়া যায় তাহাই লাভ। একবার কাজ চলিতে শুরু হইলে তাহা বরফের বলের মত ক্রমেই আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এই শক্তিকে ক্ষুদ্র মনে করা ভুল। মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও শক্তি কম নহে, উপেক্ষণীয় তো একেবারেই নহে। আর সময় নষ্ট না করিয়া যে যেখানে আছেন, দুই চারিজন হইলেও, মিলিত হইয়া কাজে নামিয়া পড়ুন। ইহাকে সমাজ-সেবা বলিয়া বড় নাম দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বাঁচিবার প্রয়োজনেই ইহা দরকার বুঝিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ুন; বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট আমাদের এই আবেদন রাখিলাম।

ছাপাখানার কাজে দেরী হওয়ায় এই সংখ্যা প্রকাশনে বিলম্ব হইয়াছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

- লেখকদের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, লেখকের অনুরোধ-সাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্ প্রিন্টও দেওয়া হয়।

- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
১৪, পার্সিবাগান লেন
কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

ষোড়শ বর্ষ চিত্ত দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন * ১৩৮১

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক, বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। নির্বিশেষ তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি অনুসৃত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হইবে না।

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Maharaja Printing Works, 6/1, Cornfield Road, Calcutta-19.